“সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা ও সমাধানের উপায়” শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১০, সকাল ১০.০০ টা, সিরডাপ মিলনায়তন, তোফখানা রোড, ঢাকা।

যৌথ আয়োজনেঃ জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশন, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র

……

সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা ও সমাধানে করণীয়

পাভেল পার্থ[1]

উৎসর্গ

চলতি লেখাটি উৎসর্গ করা হচ্ছে দেশের এক প্রবীণ তেঁতুল গাছকে। সুড়লা মৌজার সাবেক ৪৬৩ ও হাল ৫০২ দাগের ৮১ শতক জমি এই তেঁতুলতলা দেবস্থানের অর্ন্তভূক্ত যা জনসাধারনের দেবস্থান হিসেবে ১নং খাস খতিয়ান অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। চাপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের সুড়লা গ্রামের এই প্রবীণ তেঁতুল বৃক্ষ বরেন্দ্রভূমির আদিবাসীদের রক্তাক্ত ভূমিআন্দোলনের স্বাক্ষী।

বীর দিশ টান্ডি কাতে
বিলান বাইহাড় বোন তৈয়ার লেদা হো
সাঁওতাল হপোন বুদ আকিল বেগরতে
সাতু বায়াং ঠেন
সানাম জমি বোন হামেট ও চোয়েনা।
আগিল হাপড়াম মহাজন ঠেন
আডি কচলন কো কচলন কেঃ কোয়া
হায়রে হায়রে হায় বাছারে
সাঁওতাল আডি আত কচলন কো জম লেদা[2]।।

(বরেন্দ্রভূমির ওঁরাও ও সাঁওতালদের এক প্রধান সামাজিক পরব কারাম। এটি কারাম পরবের একটি গীত। এর এক ধরনের বাংলা এইরকম : বন
জঙ্গল পরিষ্কার করি, জমি জমা তৈরি করি। মহাজন নেয় কেড়ে। মূর্খ সাঁওতাল তাই, জমি যায় হাত ছেড়ে।।
পূর্ব পুরুষ যারা ছিল, মহাজন দ্বারা। অত্যাচার আর শোষণে হলো সর্বহারা।
হায় হায় বিচার আচার নাই। সাঁওতাল আমরা নির্যাতিত তাই।।)

বাংলাদেশের ‘সমতল অঞ্চলের’ আদিবাসীদের ভূমিসমস্যা এবং সমাধানে করণীয় বিষয় নিয়ে আজকের আলাপ শুরু হচ্ছে। ব্যক্তিগত বাহাস থাকলেও আজকের আলাপে ‘সাধারনভাবে চলতি অর্থে’ ব্যবহৃত ধারণা থেকেই ‘সমতল অঞ্চল’ প্রপঞ্চটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারনতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা বাদে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বরেন্দ্রভূমি, বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনিংহ অঞ্চল, উত্তর-পূর্বের সীমান্ত এলাকা, দক্ষিণ-পশ্চিাঞ্চল সুন্দরবন, চলনবিল, হাওরাঞ্চল, মধুপুর ও ভাওয়াল গড় এলাকাকে এককভাবে ‘সমতল অঞ্চল’ হিসেবে একটা সাধারন পরিচয়ে বিবেচনা করা

---

[1] গবেষক, জনউদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বারসিক, বাসা-৫০, সড়ক-১৬(নতুন), পুরাতন-২৭, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ। animistbangla@gmail.com

[2] মানিক, আখতার উদ্দিন। ১৯৯৮, বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ, উত্তরা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৩৫

হচ্ছে। আমরা জানি ভৌগলিক ভিন্নতায় দেশের ত্রিশটি প্রধান কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চল এবং ১৭টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের সবগুলোই বৈচিত্র্য ও বৈভবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। বরেন্দ্র বা গড় বা সিলেটের টিলা বনভূমি কিংবা চলনবিল এলাকা কোনোটাই ভূগোলের মাপকাঠিতে ‘সমতল’ নয়। তারপরও চলতি সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসী’ এবং এর বাইরে দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাবাদে সকল অঞ্চলের আদিবাসীদের ‘সমতল অঞ্চলের বা সমতলের আদিবাসী’ হিসেবে চিহ্নিতকরণের একটা আপাত সাধারন পরিচিতি তৈরি হয়েছে। আজকের আলাপে সেই সাধারন চল থেকেই আমরা ‘সমতল অঞ্চল’ ধারণাটিকে ব্যবহার করেছি।

যেকোনো আলাপে মনোযোগী হওয়ার জন্য আলাপের সাধারন শর্ত ও প্রয়োগসমূহের বিধি খোলাসা করা জরুরী। দেশের জাতিগতভাবে প্রান্তিক নিম্নবর্গের জণগনের এক বিশাল অংশ নিজেদের ‘আদিবাসী’ হিসেব যে পরিচয় দাঁড় করিয়েছেন সেই ‘সাধারন চল’ থেকেই আজকের আলাপে ‘আদিবাসী’ প্রপঞ্চটিও জায়গা করার অধিকার তৈরী করেছে। ‘জাতি’, ‘জাতীয়তা’ এবং ‘জাতি-রাষ্ট্র’ চলতি সময়ের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ[৩]। যদিও সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কিন্তু, জাতিগতভাবে দেশের গরিষ্ঠভাগ বাঙালি এবং বাঙালি ভিন্ন অপরাপর প্রান্তিক জাতি কারোরই সাংবিধানিক জাতিগত স্বীকৃতি নেই। আদিবাসীরা দীর্ঘসময়ব্যাপি সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসলেও রাজনৈতিকভাবে আদিবাসীদের পরিচয়কে নানান সময়ে নানানভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন নথি দলিল এবং প্রচারণায় আদিবাসীদের নিজস্ব পরিচয় ঘিরে রাষ্ট্রের এই বহুমাত্রিক বিরোধপূর্ণ চরিত্র রাষ্ট্রের দূর্বল কাঠামোকেই হাজির করে। আলাপে ঢোকার আগে এইসব বাহাস গুলো একত্র করা জরুরী।

ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪,৬,৩৪,৪৫,৫০ ধারায় ‘ Indigenous hillman(আদিবাসী পাহাড়ী) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। The Indian Income Tax act of 1922, The Indian Finance act of 1941, The Forest act of 1927 এইসব আইন নীতির ক্ষেত্রেও ` Indigenous hillman’ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। পাবর্ত্য এলাকায় প্রচলিত বাজার ফান্ড রুলস(১৯৩৭), ভূমি খতিয়ান(পার্বত্য চট্রগ্রাম) অধ্যাদেশ ১৯৮৪, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ গুলোও পার্বত্য আদিবাসীদের প্রসঙ্গ নিয়ে তৈরী। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের(১৯৫০) ৯৭ ধারাতে এবরিজিনাল শব্দটি আছে যা বাংলাদেশে ‘ইনডিজিনাস’ শব্দের কাছাকাছি এবং বাংলায় এর মানে ‘আদিবাসী’ শব্দেরই ধারেকাছে, কখনোই ‘উপজাতি’ নয়। ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফশিলের ২৭নং অনুচ্ছেদে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ি জনগণকে আদিবাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালায় আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৯৯১ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বিধি ১ শাখা ১৪৩ নং স্মারকে পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে বলা হয়েছে। ১৯৯৫ সনে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারীতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৬ ইং তারিখে লেখা সরকারী পরিপত্রেও ‘আদিবাসী গিরিবাসী (Indigenous hillman) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে আদিবাসীদের জন্য যে বরাদ্দ সেখানে ‘ সংখ্যালঘু নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী’ শব্দখানা ব্যবহৃত হয়েছে। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা সংহতিতে (৯/৮/২০০৩) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ‘আদিবাসী’ উল্লেখ করে বাণী দিয়েছেন। ২০০৫ সালের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে আদিবাসী শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রের এরকম নানান আইন ও দলিলে যেমন ‘আদিবাসী’ শব্দটি আছে আবার ‘উপজাতি’ শব্দটিও আছে। ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী শাসিত হয়। ১৯১৮ সনের বঙ্গীয় আইনেও ‘আদিবাসী’ শব্দটি পাওয়া যায়[৪]। পরবর্তীতে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন’১৯৯৮ অনুসারে প্রান্তিক জাতি অধ্যুষিত এ অঞ্চল *উপজাতি* অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। রাষ্ট্রের সকল পাঠ্যপুস্তকে ‘উপজাতি’ শব্দের সাথে কোথাও কোথাও আদিবাসীও যুক্ত করা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াও উপনিবেশিক উপজাতি শব্দটি রেখেছে। ১৯৮৫-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী

---

[৩] Mohsin, Amena. 2002 (2nd ed), The politics of nationalism : the case of the Chittagong hill tracts Bangladesh, The University press limited, Dhaka, p.1

[৪] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১১

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানেও উল্লেখ করা হয়, সকল ক্ষেত্রেই *উপজাতি* শব্দখানিই বলবৎ থাকবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজশাহী-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি-নেত্রকোণাতে আদিবাসীদের জন্য যেসব সাংস্কৃতিক একাডেমী করা হয়েছে, সেখানেও উল্লেখ করা হয়েছে, *উপজাতীয়* সাংস্কৃতিক/কালচারাল একাডেমী। সম্প্রতি এইসব একাডেমীর নাম পরিবর্তন করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিলে 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' অর্থ হিসেবে বলা হয়েছে, অফসিলে উল্লিখিত বিভিন্ন আদিবাসী তথা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণ। উল্লিখিত বিলের ধারা ২(১) এবং ধারা ১৯ এ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমি, লুসাই, কোচ, সাঁওতাল, ডালু, উসাই(উসুই), রাখাইন, মণিপুরী, গারো, হাজং, খাসিয়া, মং, ওরাও, বর্মণ, পাহাড়ী, মালপাহাড়ী নামে মোট ২৫ জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে[৫]।

আন্তজার্তিক আইনের মধ্যে আইর্ন্তজাতিক শ্রম আইন (আইএলও) কনভেনশন ১০৭ এ 'আদিবাসী ও উপজাতি' শব্দটি ব্যাখা করতে গিয়ে কনভেনশনের ১(খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, তারা দেশে বসবাসরত সেই জনগোষ্ঠীসমূহের বংশধর অথবা দেশের অভ্যন্তরে একটি সুনির্দষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহ অধিকৃত হবার পূর্বে বা উপনিবেশিকতা স্থাপনের পূর্বে। স্বতন্ত্রভাবে আইনী মর্যাদার ভিত্তিতে তারা সাবলীলভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোগ করতো সেই সময়ে বর্তমানে তারা যেসব দেশে বসবাস করছে তার তুলনায়। অপরদিকে ১৯৮৯ সালের আর্ন্তজাতিক শ্রম আইনের ১৬৯ এর ১(খ) তেও একইভাবে উল্লেখ করা হয় যে, স্বাধীন দেশের জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে তারাই আদিবাসী হিসেবে বিবেচিত হবে উপরোক্ত দেশের বসবাসরত জনগোষ্ঠীর বংশধারার ভিত্তিতে অথবা সেই ভৌগলিক অঞ্চলে যেটি বর্তমান সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে অধিকৃত হওয়ার মাধ্যমে কিংবা উপনিবেশিকতার কারনে অথবা বর্তমান রাষ্ট্রসীমা সৃষ্টির প্রাক্কালে। অপরদিকে তারা স্বতন্ত্রভাবে আইন মর্যাদা ভোগ করছে আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে তাদের স্ব স্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে[৬]।

দ্রং (২০০৮) জানিয়েছেন, বাংলাদেশে উপজাতি কিংবা আদিবাসী শব্দটি অনেক সময় এক অপরের পরিপূরক হিসেবে সরকারিভাবে বিবেচিত হয়[৭]। ১৯৮৫-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা অনেকের কাছেই শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। উক্ত চুক্তির প্রথম শর্ততেই 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ রাখার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বনবিভাগ কর্তৃক দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ৭ জুন, ২০০৩ খৃ. - এ 'মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প' সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপনটি মধুপুরের আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশ বনবিভাগ[৮]।

---

[৫] সূত্র : বাঃসঃমুঃ-৩১১২ জি-০৯/১০ (কম/জি), ১,১০০ কপি, ২০০৯

[৬] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১১-১২

[৭] পূর্বোক্ত, পৃ.১২

[৮] বিভিন্ন পত্রিকায় মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পর প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে বনবিভাগের ব্যাখ্যা : বিভিন্ন পত্রিকায় মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ফলে স্থানীয় আদিবাসীদের উচ্ছেদ, গেট নির্মাণ, যাতায়ত বাধাগ্রস্ত করা, চাষাবাদ বিঘ্নিত করা, টোল আদায় ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে বিধায় উহা নিরসনের লক্ষ্যে এসম্বন্ধে বনবিভাগের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলোঃমধুপুর জাতীয় উদ্যানটি ২১ হাজার একর সংরক্ষিত বনভূমি নিয়ে গঠিত। অতীতে এই শালবনটি বিবিধ প্রজাতির গাছ ও বন্য পশু-পাখিতে সমৃদ্ধ ছিল । কালক্রমে ইহার প্রায় অর্ধেক এলাকা স্থানীয় আদিবাসী ও অ-উপজাতীয়দের দ্বারা জবর দখল হয়ে যায়, ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। বর্তমানে জাতীয় উদ্যান এলাকায় কিছু সংখ্যক বানর, হনুমান, হরিণ, ও অন্যান্য পশু-পাখি আছে, যারা খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও পশু-পাখির নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক সালে বাঙলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় মধুপুর উদ্যানের ২১ হাজার একর বনভূমির মধ্যে কোর এলাকার প্রায় ৩,০০০.০০ একর বনভূমির চারদিকে বেষ্টনী নির্মাণ করে মধুপুর বনাঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ ও পশুপাখিসহ বিভিন্ন বন্যপ্রানীর নিরাপদ আবাসস্থল নির্মাণের কর্মসূচী রয়েছে।স্থানীয় আদিবাসীদের সহায়তা ব্যতিত এই ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বন বিভাগ অত্যন্ত সচেতন বিধায় প্রস্তাবিত বেষ্টনীর বাহিরে সরকারী বন এলাকায় স্থানীয় আদিবাসী ও অ-উপজাতীয়দের সম্পৃক্ততায় অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে প্রায় সাত হাজার পাঁচশত একর বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। উহার দ্বারা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। বেষ্টনীর ভিতরে কোন উপজাতীয়দের ঘরবাড়ী কিংবা চাষাবাদের জমিজমা নাই, কাজেই তাদের উচ্ছেদের প্রশ্ন অবান্তর। বেষ্টনীর ভিতরে যাতায়তের রাস্তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং রাস্তাগুলো ব্যবহারের জন্য কোন টোলও আদায় করা হবে না। বনবিভাগ শুধু পশুপাখিদের একটি নিরাপদ আবাসস্থল রাখার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। হয়তঃ ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিগুলোও এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে,এখানেই গড়ে উঠবে বন্য প্রাণীদের একটি নিরাপদ অভয়ারণ্য। আমাদের দেশের ক্ষয়িষ্ণু বনভূমি, বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর জন্য পরিবেশবিদ তথা জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো ৭ জুন ২০০৩ খৃ.)

বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো ১৯ এপ্রিল ২০০৬ তারিখের একটি চিঠিতে ‘আদিবাসী’ নয়, ‘উপজাতি’ শব্দটি লেখার অনুরোধ জানানো হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নবম জাতীয় সংসদ নিবার্চনী ইশতেহারে ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’ , ‘আদিবাসী’ ও ‘ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী’ শব্দসমূহ ব্যবহার করেছে[৯]। বাংলাদেশের কডিনিস্ট পার্টি[১০] ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি[১১] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী ইশতেহারে ‘আদিবাসী’, ‘ক্ষুদ্র জাতিসত্তা’ ও ‘সংখ্যালঘু জাতিসত্তা’ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণ’, তফশিলী সম্প্রদায় ও ‘আদিবাসী’ শব্দগুলো ব্যবহার করেছে[১২]।

বাংলাদেশের আদিবাসীদের যেমন কোনো একক রাষ্টীয় পরিচয় নেই, তেমনি নেই আদিবাসী বিষয়ক কোনো বিশ্বস্ত কার্যকরী জনসংখ্যানুপাতিক তথ্য উপাত্ত। রাফী (২০০৬) আদিবাসীদের নিয়ে এক সংখ্যানুপিাতক সমীক্ষায় বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করে দেখিয়েছেন, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীরা দেশের মোট জনসংখ্যার এক দরিদ্রতম ক্ষুদ্র অংশ[১৩]। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইন ২০০৪ (The State aquisition and Tenancy (Amendment) act 2004) এর ৯৭ ধারায় আদিবাসীদের ‘Aboriginal’ হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, বনিয়াস, ভুঁইয়া, ডালু, হাদী, ভূমিজ, গারো, হাজং, খাসিয়া, কোচ, মগ, খোড়া, ওঁরাও, দালুজ, মেচ, মুন্ডা, তোড়ি, খারওয়ার, মাল, সুরিয়া, পাহাইয়াস, মন্ডিয়া, গন্ডা, তুরিস এই চব্বিশটি জাতির কথা নথিভূক্ত করা হয়েছে[১৪]। ১৯৯১ সনের আদমশুমারীতে দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩০টি দেখানো হয়েছে এবং অন্যান্যসহ লোকসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০১ সালের আদমশুমারীতে আদিবাসী জনসংখ্যাকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-টু) দলিলে ২০০১ সালে আদিবাসী জনসংখ্যাকে দেখানো হয়েছে প্রায় ১৮ লাখ। এক্ষেত্রে ১৯৯১ এর জনসংখ্যার সাথে ২০০১ সনের জন্মহার দিয়ে গুণ করে ২০০১ সনের আদিবাসী জনসংখ্যা হিসাব করেছে সরকার। দ্রং (২০০৮) জানিয়েছেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫ এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ বলে দাবি করে আসছে[১৫]। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন ‘উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী’ সমূহের নাম বদলে ‘নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী’ ব্যবহার করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিল পাশ হয়েছে। উল্লিখিত বিলের ধারা ২(১) এবং ধারা ১৯ এ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গা, বম, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, খুমি, লুসাই, কোচ, সাঁওতাল, ডালু, উসাই(উসুই), রাখাইন, মণিপুরী, গারো, হাজং, খাসিয়া, মং, ওরাও, বর্মণ, পাহাড়ী, মালপাহাড়ী নামে মোট ২৫ জনগোষ্ঠীর নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে[১৬]। বাংলাদেশের কোচ-হাজং-ডালু-বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী-মৈ তৈ মণিপুরী-লালেং-চাকমা-ত্রিপুরা-রাখাইন-ম্রাইনমা-খাসি-মান্দি-বানাই-খাড়িয়া-মাহালি-লুসাই-ম্রো-পাংখো-বম-মুন্ডা-লেঙাম-সাঁওতাল-ওঁরাও-ভূমিজ-দেশোয়ালি-কর্মকার-হদি-রাজবংশী-ক্ষত্রিয়বর্মণ-পাঙন-চাক-তঞ্চংগ্যা-কোল-মিজো-পাহাড়িয়া-খুমি-খিয়াং-কন্দ জাতিসমূহের প্রান্তিকতা এতোটাই স্পষ্ট যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রবলভাবে বাঙালি জাত্যাভিমান হাজির ও বহাল রাখে। আর এই প্রান্তিক জাতিদেরকেই অধিপতি রাষ্ট্র আমাদের কাছে কখনো ‘উপজাতি’, কখনো ‘আদিবাসী’, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, ট্রাইবাল, এথনিক মাইনরিটি, ইনডিজিনাস পিপল, এবঅরিজিনাল, নৃ-

---

[৯] দিন বদলের সনদ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা।

[১০] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : নির্বাচনী ইশতেহার, ২০০৮, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ.১৮-১৯

[১১] ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ.১৩

[১২] সূত্র : http://kanakbarman.wordpress.com/2008/12/19/manifesto-of-bnp-2008/

[১৩] Rafi, Mohammad. 2006, Small ethnic groups of Bangladesh : a mapping excercise, Panjeree Publications Ltd, Dhaka, p. 2

[১৪] ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : পাকিস্থান ও বাংলাদেশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫৪

[১৫] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১০-১১

[১৬] সূত্র : বাঃসঃমুঃ-৩১১২ জি-০৯/১০ (কম/জি), ১,১০০ কপি, ২০০৯

গোষ্ঠী, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এরকম নানান নামে পরিচয় করায়। প্রান্তিক জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যা কোথাও বলে বারো লাখ, কোথাও আঠারো লাখ, কোথাও বলা হয় তিরিশ লাখ। কোথাও দেখানো হয় জাতি সংখ্যা ২৪, ২৫, ২৭ আবার কোথাও দেখানো হয় ৪৫ বা তারও কম বেশী। আমরা আজকের আলাপে এই আদিবাসীদের ভেতর যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার বাইরে বসবাস করছেন তাদেরকেই ‘সমতল অঞ্চলের আদিবাসী’ হিসেবে পাঠ করছি। ‘আদিবাসী’ শব্দ এবং ধারনাটির এক ব্যাপক রাজনৈতিক বিস্তৃতি দক্ষিণ এশিয়ায় আছে, এর মানে কোনো ভাবেই ‘আদি বাসিন্দা’ নয় সেটি খেয়াল রাখবার বিনীত প্রার্থনা জানিয়েই আমরা সরাসরি সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা এবং সমাধানে করণীয় কিছু প্রসঙ্গকে কার্যকরী করে তোলার তাগিদে আলাপে প্রবেশ করছি।

আদিবাসীদের জোর করে ভূমিহীন করা হচ্ছে

> মান্দি কুসুকে (মান্দি জাতির আ.চিক ভাষায়) আগ রাং ব্রিং মানে হল নিজস্ব স্বাধীন বনভূমি। মান্দি ইতিহাস মতে, মানুষ মানে মান্দিদের জন্ম হয় চিগেলবাড়িওয়ারিখুট্টি নামের এক পাহাড়ি অরণ্য-দ্বীপে। তারপর মান্দিরা ঘুরেছে কত বনপথ-পাহাড়টিলা-সমতল-জলাভূমি। যেখানে গড়ে উঠেছে মান্দিদের নিজস্ব সভ্যতা সেখানেই তাদের আগ রাং থাং এবং চিদিক থাং মানে নিজস্ব *সায়ত্ত্বশাসিত* ভূমি। এই ভূমিতে মান্দিরা স্বাধীন হাবাহুইছাআ (জুমআবাদ) করেছে। আনন্দ-বেদনায় চিৎকার দিয়ে বলেছে, এই আমার বাড়ি, এই আমার ঘর। এই আমার পরিবার। এইখানেই আমার আচ্চু-আম্বির (দাদা-নানী) নিজস্ব ঘর। এখানে কোনো চিন্তা নাই, এখানে চু (ঐতিহ্যগত সামাজিক পানীয়) খেয়ে আমি আমার মত নাচতে পারি, গাইতে পারি। এখানে আমাকে বাধা দেয়ার কেউ নাই। মান্দি কুসুকে একে বলে আগরাং থাং উ অক্কেল নোওয়া এবং চিদেক থাং উ গিসেক নোওয়া। সামেগারো গ্রামেই মান্দিদের পয়লা বাজার ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠে। মিসি সালজং, গঙ্গা আ.হনিং দগিসিম, সুষিমি সিঙ্গেফা ও কামাল আয়েফা আজেফারা ঐ বাজারে আসতেন। ওসমান মাংসাং আর সংরাম সামপালদের কাছ থেকে আমি মান্দিদের সেইসব সভ্যতার কথা শুনেছি। হা.বিমাতে (মান্দিরা টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনভূমি এলাকাকে হা.বিমা বা মাতৃভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেন) তাদের মতো মান্দি ইতিহাস কেউ জানতো না। মান্দিদের সেইসব দিন এখন আর নাই। মান্দিরা কোনোদিনই নিজেদের মাটির মালিক মনে করে নাই। জমির কাগজপত্র রাখে নাই। নিজের স্বাধীন জায়গায় আর মান্দিরা পরাধীন হইছে, মাটি হারাইয়া কোনোরকমে টিকা আছে। এক মান্দি নাম পরিচয় আর চেহারায় কিছু ছাপ ছাড়া আর কিছুই এখন নাই[১৭]।

১৪,৭৫৭০ বর্গ কি.মি. বাংলাদেশের মোট স্থল ভূমির পরিমান ১৩,৪৬১৫ বর্গ কি.মি এর ভেতর ভূমির পরিমান ১৪.৪০ মিলিয়ন হেক্টর[১৮]। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপর পরিবারভিত্তিক ভূমি সংরক্ষণ সীমা ৩৭৫ বিঘার স্থলে ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকের খাজনা মওকুফ করা হয়। পাকিস্থান আমলের বকেয়া খাজনাও মওকুফ করা হয়। ভূমি সংস্কার আইন ১৯৮৪ অনুযায়ী ভূমি সংরক্ষণ সীমা ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়[১৯]। বাংলাদেশে বিষমহারে ভূমিবন্টন ও ব্যবস্থাপনা অব্যাহত আছে। কৃষিজমি দিনে দিনে কমে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আদিবাসীরা যেহেতু জুম ও কৃষির উপর নির্ভরশীল তাই এক্ষেত্রে আদিবাসী ভূমিই অকৃষিখাতে ভূমি ব্যবহারের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৮৭ সালের ভূমি সংস্কার আইনে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘ভূমিহীনের’ বৈশিষ্ট্য পরিচয় তৈরী করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে, সেই পরিবার ভূমিহীন যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষিজমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর। যে পরিবারের বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষি জমি নেই অথচ কৃষি নির্ভর। যে পরিবারের বসতবাটি এবং কৃষি জমি উভয়ই আছে কিন্তু উহার মোট পরিমান ০.৫০ একরের কম অথচ কৃষি নির্ভর তারাই ভূমিহীন[২০]। রাষ্ট্রীয় আইনের ভাষ্য ও নথিমতে দেশের

---

[১৭] মান্দি দার্শনিক জনিক নকরেকের (১০০) বয়ান। টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবনের চুনিয়া গ্রামের এই প্রবীণ দার্শনিক এখনও নিজস্ব সাংসারিক ধর্ম আর মান্দি দাকবেওয়াল (সংস্কৃতি) নিয়ে মুমূর্ষু শালবনের কংকালের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ওয়ান্না ১৪১২

[১৮] ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : পাকিস্থান ও বাংলাদেশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৬

[১৯] পূর্বোক্ত। ভূমিকা

[২০] সূত্র : ভূমি সংস্কার অভিযান ১৯৮৭, নম্বর ভূমি-কোষ/১-১/১৭, তারিখ ১/৭/৮৭, ভূমি সংস্কার সেল, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৪১ নং ধারা-ক,খ,গ)

অধিকাংশ আদিবাসী পরিবারই আজ ভূমিহীন। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই ভূমিহীনতার কাহিনী করুণ এবং প্রশ্নহীন। আদিবাসী ভূমি ও অঞ্চলের ভূমিবিরোধকে কোনো ধরনের সুরাহা না করেই ১৯৮৪ সনে দেশের মহকুমাকে পুর্নবিন্যাস করে ৬৪টি জেলা গঠন করা হয়।

১৭৬৫ সনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার ওড়িশা তথা 'সুবে বাংলার' দেওয়ানী অধিকার অর্জন করল। তারপর তেকেই রাজস্ব আদায় ও বৃদ্ধির ওপর কোম্পানির শাসকেরা জোর দিল। তাদের বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় পুঁজি হিসাবে সংগৃহীত রাজস্বকে কাজে লাগানোর দিকেই তাদের ঝোঁক ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল তখন সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। এজন্য ভূমি ব্যবস্থায় দশশালা বা পাঁচশালা বন্দোবস্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। আবহমান কাল থেকে কৃষকেরাই জমির প্রকৃত মালিক ছিল, কৃষকেরা তাদের চিরকালের এই অধিকার হারাল। জমির সামাজিক বা গোষ্ঠী মালিকানা বিলুপ্ত হল। জমিতে ব্যাক্তিগত মালিকানা কায়েম হল, জমি পণ্যে পরিণত হল। এতকাল উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব হিসেবে জমিদার বা রাজাদের দেবার যে ব্যবস্থা চিল তা লোপ পেল। নগদ বা মুদ্রায় খাজনা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। জমি পণ্য হিসেবে গণ্য হবার ফলে তা কেনাবেচার সামগ্রী হিসেবেও গণ্য হল[২১]। বাংলার নবাবের আমলের শেষ বছরে ১৭৬৪-৬৫ সনে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৮,১৭,০০০ পাউন্ড। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি হওয়ার পর রাজস্ব আদায় করা হয় ৩৪ লাখ পাউন্ড, যা নবাবী আমলের চাইতে প্রায় সাড়ে চার গুণ বেশী। এত অল্প সময়ে এত গুণ রাজস্ব বৃদ্ধি খুব কমই দেখা যায়। তাই রাজস্ব আর বাড়ানোর চাইতে রাজস্ব আদায়য়ের নিশ্চয়তাই হয়ে উঠেছিল প্রধান পন্থা। নির্দিষ্ট সময়ে জমিদাররা যাতে রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য হন তার জন্য চালু করা হল সুর্যাস্ত আইন ও নানারকম কঠোর শাস্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে কৃষকদের কি সর্বনাশ করল, মাত্র উনিশ বছর পরে লর্ড সভার পঞ্চম রিপোর্টে তার স্বরূপ কিছুটা উদঘাটিত হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে নিদারুন দুর্দশা ও ভিক্ষাবৃত্তি সৃষ্টি করেছে, বাংলার ভূ-সম্পত্তিতে যে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত করেছে, বোধহয় কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মারফতে আর কোনও দেশে আর কোনো যুগে এত অল্প সময়ের মধ্যে তা আর সম্ভব হয় নি[২২]।

১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি(সরকাররি রাজস্ব আদায়ের অধিকার) লাভ করল তখন তার সরকার, শাসনের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য, যথা, দেশ থেকে রাজস্বের পরিমান সর্বাধিক করা এবং বাংলার ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য সরকারি ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করল এবং জমিদারের সৈন্যসামন্তের সংখ্যা হ্রাস করবারও চেষ্টা করল। ১৭৭১ সালে জে. লরেল দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় নতুন রাজস্ব বন্দোবস্ত করার বিশেষ কর্মভার প্রাপ্ত হয়ে প্রেরিত হন। দিনাজপুরে তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য সমস্ত জমিদারিটি এক থেকে তিন বছরের জন্য সত্তরটিরও বেশি েটে ছোট ইজারাদের হাতে তুলে দেন এবং যেসব চৌধুরি, পরগণাগুলির ভারপ্রাপ্ত জমিদারদের স্থানীয় কর্মচারী ছিলেন তাদের সবাইকে বরখাস্ত করে জমিদারদের 'অত্যধিক প্রবাব' খর্ব করার প্রতিও একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ১৭৯২ সনে পাশ হওয়া 'বাংলা বিহার উড়িষ্যার কালেক্টরশিপের পুলিশি আইন' এর মাধ্যমে কোম্পানির সরকার জমিদারদের পুলিশি বা থানাদারি ব্যবস্থাকে অধিগ্রহণ করে। সরকারি পুলিশ অফিসার বা দারোগা শ্রেণী নিয়োজিত হলেন জমিদারি এলাকায় তাঁদের সাহায্যের জন্য বা রইল আধাসামরিক বাহিনী। দিনাজপুর জমিদারিটি ২৫টি থানা বা পুলিশি এলাকায় বিভক্ত হল এবং একজন করে দারোগা তাঁর বাহিনীসহ নিযুক্ত হলেন প্রতিটি থানায়। ১৭৮৭/৮৮ সনে দিনাজপুর জেলাটি ২৮টি জমিদারি নিয়ে গঠিত ছিল, কিন্তু জেলাটির প্রায় নব্বই শতাংশ নিয়ে গঠিত পুরাতন জমিদারের জমিদারিটির পতনের অব্যবহিত পরেই তার মালিক হলেন কম করেও ৪০০ জন ছোট ছোট জমিদার। কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থা এবং ভূমির-বাজারের উদ্ভব হল নতুন উপাদান যেগুলির অভিজ্ঞতা 'পুরানো' জমিদারদের আগে হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেই বিপুল পরিমানে সরকারি ও বেসরকারি জমি ও ভূমির বিক্রি ঘটে[২৩]।

---

[২১] চৌধুরী, অরুণ। সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভারত। ২০০৬, পৃ. ১-১৭

[২২] চৌধুরী, অরুণ। সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীয়দের সংগ্রাম, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ভারত। ২০০৬, পৃ. ৩৯

[২৩] তানিগুচি, শিনকিচি। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও দিনাজপুর জমিদারির অবসান। এই লেখাটি শিনকিচি তানিগুচি, মাসাহিকো তোগাওয়া এবং তেৎসুইয়া নাকাতানি সম্পাদিত 'গ্রামবাংলা : ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতি' শীর্ষক পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। আই সি বি এস, দিলীর পক্ষে কে পি বাগচী কোম্পানী, কলকাতা, ভারত, ২০০৭, পৃ. ৫-২৬

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবিভক্ত ভারতে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য দুইই স্থাপন করার পর শুরু হল ভূমিকেন্দ্রিক জবরদখল এবং আদিবাসী নিপীড়ন। ১৭৭২ সালে ইংরেজ সরকার ক্যাপ্টেন ক্যামাককে পার্লামেন্টের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি ছোটনাগপুরের প্রাচীন জমিদারদের উচ্ছেদ করে বসালেন নতুন জমিদার। এ সকল ব্যাক্তিরা সেখানকার জনসাধারনের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। কেবল ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য আদিবাসী প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করে কর আদায় করা শুরু হল। জমিদারদের অত্যাচার ক্রমশঃ এত বেড়ে যেতে লাগল যে আদিবাসীরা অতিষ্ট হয়ে উঠল[২৪]।

সেন ও অন্যান্যরা (২০০৭) রাজশাহী, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার আদিবাসীদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, উল্লিখিত এলাকার প্রায় ৪১.২ ভাগ আদিবাসী ভূমিহীন। রাজশাহীতে ৩৯.৯% পরিবার, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে ৮০.২% এবং সিলেট অঞ্চলে ২৮.২% পরিবার ভূমিহীন। রাজশাহী অঞ্চলে ১৪০ পরিবার এবং সিলেটের ১৭৯ পরিবারের ভূমি বেদখল হয়েছে[২৫]। গাইন এবং অন্যান্যরা (২০০০) এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, ২৭.০১ ভাগ আদিবসী সম্পূর্ণ ভূমিহীন[২৬]। আইয়ুব ও অন্যারা (২০০৯) একটি লেখায় জানিয়েছেন, মূলস্রোতের মানুষসৃষ্ট বিবিধ বৈরী আবহে দেশের অর্ধশতাধিক আদিবাসী নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ বর্তমানে ভূমিহীন। কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এর হার শতকরা ৫০ ভাগ, আবার কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ৯৫ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল শতকরা ২০-২৫ ভাগ, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯০ ভাগে[২৭]।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও বরেন্দ্র জনপদ

রায় ও অন্যান্যরা (২০০৭) বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের উপর পরিচালিত শিক্ষা ও ভূমি বিষয়ক বেশকিছু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, সমতল এলাকার আদিবাসীরা বিচ্ছন্ন ও বিক্ষপ্তভাবে সমতল এলাকার বিভিন্ন জেলায় বসবাস, সংখ্যালঘিষ্ঠতা এবং নানা শোষণ ও নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এখনও প্রান্তিকপর্যায়ে রয়েছেন। নিজের জমির রেকর্ড রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রভাবশালীদের নজরে পড়ে উক্ত জমি জবরদস্তি দখল হচ্ছে এবং অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে জালিয়াতি করে অনেকে তাদের জমি দখল করেছে। আর এভাবে জমির মালিকানা থেকে দিন দিন আদিবাসীদের নাম মুছে যাচ্ছে[২৮]। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় আখতার (২০০৪) জানিয়েছেন, বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালী, পাহান, রবিদাস, পাহাড়ি, সিং, রাজোয়ার আদিবাসীরা ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ছে[২৯]। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী, মাহালী, কোচ আদিবাসীদের ভেতর পরিচালিত এক সমীক্ষায় কামাল (২০০০) জানিয়েছেন, অধিকাংশ আদিবাসীরাই নিজস্ব ভূমি হারিয়েছেন। প্রায় ৪২ শতাংশের কোনো জমি ও বসতভিটা নেই[৩০]। কামাল (২০০১) রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসীদের ভেতর অপর এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন প্রায় ৪২.৭ ভাগ আদিবাসী ভূমিহীন এবং ৫৩.৬ ভাগ ক্ষেতমজুর[৩১]।

---

[২৪] হেমব্রম, পরিমল। সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে। আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত। ২০০০, পৃ.১০৮-১১৬

[২৫] সেন, সুকান্ত; রায়, অভিজিৎ ও লামিন, সিলভানুস। ২০০৭, সমতলের আদিবাসী : অধিকার ও অধিকারহীনতা, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৯৪-৯৯

[২৬] Gain, P., Moral, S. Tigga, S.E. 2000, Discrepancies in census and scio-economic status of ethnic communities, SHED, Dhaka

[২৭] হোসেন, আইয়ুব; হক, চারু ও রিন্তি, রিজুয়ানা। ২০০৯, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, হাক্কানী পালিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৩৯

[২৮] রায়, অভিজিৎ; শামীম, মুহাম্মদ শাহেদুর রহমান; সুমী, ফারজানা রহমান; মিতুল, জাহানারা প্রধান; লামিন, সিলভানুস এবং সেন, সুকান্ত। ২০০৭, সমতল ভূমির আদিবাসীদের শিক্ষা ও ভূমি অধিকার (প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও গবেষণা), বারসিক, ঢাকা, ভূমিকা অংশ

[২৯] Akhter, S. and M., Kamal. 2004, Indigenous society in North Bengal : a participatory study, RDC, Dhaka

[৩০] Kamal, Mesbah. 2000, Baseline survey on indigenous peoples of Northwest Bangladesh, RDC, Dhaka

[৩১] কামাল, মেসবাহ। ২০০১, বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসীদের সাম্প্রতিক সমস্যাবলী : একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক পর্যালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ : সংখ্যা ৮০, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের প্রতিনিয়ত নিজস্ব ভূমির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা প্রসঙ্গে মানিক (১৯৯৮) লিখেছেন, এটা ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, বাংলাদেশের আদিবাসীরাই বিশ্বের সর্বাধিক নিপীড়িত সম্প্রদায়। আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ। কোনো আদিবাসীকে সাহাজী বলে সম্বোধন করলে সে খুব খুশী হয়। সাহাজী বলতে স্থানীয়ভাবে ধনবান ব্যাক্তি বোঝায়। তারপরে একসময় তার সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়। আদিবাসীরা তা টের পায় না। আদিবাসীদের জমি বিনা রেজিষ্ট্রিতে এক শ্রেণীর দখলদার মানুষ জবরদখল করে ভোগ করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এসে উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের জমিজমা সব দখল করে নিয়েছে। তাদের হাতে আদিবাসীরা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে[৩২]। দেশের কৃষক ও স্বাধীনতা আন্দোলনসহ সকল জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি ও বিবেচনা করা হয়না কখনোই। এমনকি উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা পরিবার গুলোও আজ ভূমি ও স্বীকৃতিহীন এক দু:সময় পাড়ি দিচ্ছেন। পার্থ ও হোসেন (২০০৯) একটি বইতে উত্তরবঙ্গের ৬৯ জন আদিবাসী পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার বিবরণ দিয়েছেন যেখানে গরিষ্ঠভাগই উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা হিসেবে ভূমি সমস্যাকে দেখিয়েছেন[৩৩]।

আলম (২০০৬) উত্তরবঙ্গের সাঁওতালদের ভূমিহীনতা প্রসঙ্গে বলেছেন, নব্বই শতাংশ সাঁওতালদের পূর্বে নিজেদের কৃষিজমি ছিল এবং তারা নিজের জমিতেই কৃষিকাজ করতো। তাদের মধ্যে বর্তমানে পঁচাশি শতাংশ লোকের কোনো জমি নাই[৩৪]। সাঁওতালদের ভূমিহীনতা প্রসঙ্গে জাহান (২০০৮) জানিয়েছেন, বাঙালি কর্তৃক সাঁওতালদের জমি জোরপূর্বক দখল, জাল দলিল তৈরি, জমি হারানো, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়াবলী বাঙালি-সাঁওতাল সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে[৩৫]। দ্রং(১৯৯৭) তার দিনাজপুর ভ্রমনের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, দিনাজপুর জেলার মহেশপুরে এসে এখানকার আদিবাসীদের সাথে কথা বলেও জানতে পারলাম, এখানের আদিবাসীদেরও প্রধান সমস্যা জমি। সাঁওতালী ভাষায় দুই অর্থ বার। সাঁওতাল হয়তো বার একর বা দুই একর জমি বিক্রি করেছেন। কিন্তু কথার মারপ্যাঁচে সে জমির পরিমাণ হয়ে গেছে বার। এভাবে দুই একর বা বার একর জমি বারো একর হয়ে যায় বাংলায়। এ থেকে সুযোগ নেয় কিছু টাউট-বাটপার ও খারাপ লোক। তারা আদিবাসী নয়[৩৬]। কামাল ও অন্যান্যরা (২০০৩) জানিয়েছেন, সাঁওতাল সমাজে ভূমিই হল প্রদান সম্পদ। ১৯৮০ দশকের শুরু বাংলাদেশ বনবিভাগ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জের প্রায় ১৫০০ একর ভূমি দখল করে। যে ভূমির প্রায় নব্বই শতাংশ মালিকানা সাঁওতাল এবং দশ শতাংশ বাঙালিদের[৩৭]। সাঁওতালদের ভূমি দখলের জন্য বাঙালি ও বনবিভাগকে দায়ী করে কামাল ও বানু (২০০৩) জানান, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি এবং বনবিভাগের মাধ্যমেই আদিবাসী সাঁওতালদের অধিকাংশ ভূমি দখল হয়ে থাকে[৩৮]।

উত্তরবঙ্গের সকল আদিবাসীদের জীবনই আজ ভূমিবিরোধ ও ভূসম্পদকেন্দ্রিক চূড়ান্ত সংঘর্ষের প্রান্তসীমায় টলছে। বিশ্বাস (২০০৫) রাজবংশী আদিবাসীদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে বলেছেন, বাংলাদেশের রাজবংশীরা অধিকাংশই

---

[৩২] মানিক, আখতার উদ্দিন। ১৯৯৮, বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ, উত্তরা প্রকাশনা, ঢাকা, ১০-১১

[৩৩] পার্থ, পাভেল ও হোসেন, মোয়াজ্জেম। ২০০৯, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা (প্রথম ভাগ), গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, দিনাজপুর।

[৩৪] আলম, একেএম মুকসুদুল। ২০০৬, পরিশ্রমি সাঁওতাল জাতির বর্তমান অবস্থা, ড. আতিউর রহমান সম্পাদিত প্রান্তস্বর পত্রিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। ২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, সমুন্নয়, ঢাকা, ৬

[৩৫] জাহান, ফারহাত। ২০০৮, বাংলাদেশের সাঁওতাল ও ভূমি সম্পর্ক, সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫৩তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আন্দোলন প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা 'হুল' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেছেন জয়ন্ত আচার্য, জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, হিরণ মিত্র চাকমা, রাজিব ত্রিপুরা ও মাইবম সাধন। ঢাকা, পৃ. ২৭ (যদিও পৃষ্ঠা নং মুদ্রিত হয়নি)

[৩৬] দ্রং, সঞ্জীব। ১৯৯৭। আদিবাসী মেয়ে, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ.১৫১

[৩৭] Kamal, Mesbah; Samad, Dr. Muhammad & Banu, Nilufar. 2003, The Santal community in Bangladesh : problems and prospects, RDC, Dhaka, p. 16-20

[৩৮] Kamal, M. and Samad, Dr. M Banu. 2003, Santal community in Bangladesh : problems and prospects, RDC, Dhaka

ভূমিহীন কৃষক ও অল্প জমির মালিক[৩৯]। গোমেজ (১৯৮৮) এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিাঞ্চলের পাহাড়িয়া আদিবাসীদের প্রায় ৬২ শতাংশ ভূমিহীন[৪০]।

মধুপুরগড় ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল

> জুম চাষ আমাদের সমাজেরই অংশ...।
> ১৯৬০ সালের আগে আমাদের পিতা ও পিতামহগণ জুম চাষ করেছেন
> এবং আমরা সেই জুম চাষ চালিয়ে এসেছি। আর ১৯৭০ সালের পর আমাদের
> স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাঙালিরা এল এবং জঙ্গল কেটে ফেললো,
> ফলে আজ আর জুম চাষের জায়গা নেই, নেউ গভীর জঙগল[৪১]...

উপরের উদ্বৃতিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের এক জুমিয়া নারীর। সেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক জুম নিয়ন্ত্রণ বনবিভাগ থাকার পরও এখনও কিছু জুমআবাদ হয়। কিন্তু আমরা উত্থাপন করছি মধুপুর শালবনের জুমআবাদের কথা যার সাথে মধুপুরগড়ের আদিবাসীদের ভূমিসমস্যার প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধুপুর শালবনে আজ আদিবাসীদের যে রক্তক্ষয়ী ভূমিআন্দোলন তার মূল কারন রাষ্ট্র কর্তৃক আদিবাসীদের জুমআবাদ জোর করে বন্ধ করে দিয়ে আদিবাসীদের প্রথাগত বনভূমিঅধিকার থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা। জুমআবাদ বন্ধ করে মধুপুরকে একবার জাতীয় উদ্যান, একবার এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের রাবার বাগান, একবার সামাজিক বনায়নের নামে আগ্রাসি বাণিজ্য, আনারসের পর কলা, ইকোপার্ক, আইপ্যাক নানান কায়দায় চোখের সামনে রাষ্ট্র গলাটিপে মধুপুর শালবন ও শালবনভূমির প্রাণসম্পর্ক হত্যা করছে। বার্লিং(১৯৯৭) মধুপুর শালবনে মান্দিদের জুমচাষ প্রসঙ্গে বলেনছেন, পাহাড়ি এলাকার গারোরা ঐতিহ্যবাহী জুম চাষের চর্চা করতেন। একটি এলাকা পরিষ্কার করে আগুন দিয়ে ঐ এলাকাটি চাষের জন্য ১/২ বছর ব্যবহার করতেন। কোনো ধরনের সেচ ছাড়া গারোরা এক বিশেষ ধরনের ধান জন্মাতেন বর্ষা মওসুমে। বার্লিং মধুপুরের মান্দিদের জুমচাষের প্রসঙ্গকে বলেছেন এটি আগে ছিল কিন্তু এখন বর্তমান নেই হিসেবে। বার্লিং মধুপুর এলাকায় ১৯৫০ দশক থেকেই ভূমি অধিকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ গুলো শুনে এসেছেন। বার্ষিক ব্যক্তিগত জুমভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা না হলেও গ্রামের আভ্যন্তরীণ জমি নিয়ে ছিল সীমাহীন বিরোধ[৪২]। মোহসীন (১৯৯৭) মধুপুর শালবন এলাকায় মান্দি (যদিও তিনি ‘গারো শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মান্দিরা নিজেদেরকে মান্দি নামে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে) আদিবাসীদের ভূমিহীনতার প্রসঙ্গ টেনে বলেন :

---

[৩৯] বিশ্বাস, অশোক। ২০০৫, বাংলাদেশের রাজবংশী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৭৫

[৪০] Gomes, Father Stephen G CSC. 1988, The Paharias : a glimpse of tribal life in Northwestern Bangladesh, CARITAS Bangladesh

[৪১] জীবন আমাদের নয় : বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ও মানবাধিকার, ২০০১, Life is not ours : land and human rights in the Chittagong hill tracts, Bangladesh, 1991 including updates 2000, International work group for Indigenous affairs (IWGIA), Denmark, এই বইটির বাংলা সংস্করন প্রকাশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, ঢাকা, পৃ. ৮০

[৪২] Burling, Robbins. 1997. The strong women of Madhupur, The University Press Limited, Dhaka, pp 25, 52

...এটা সহজবোধ্য যে সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রের ব্যাখান আধিপত্যশীল। এটা রাষ্ট্রকে সে ধরনের নীতি গ্রহণের অনুমতি দেয় যা কিনা সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করতে পারে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহে এটা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। এথনিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় এরূপ ব্যাখান এবং এর অনুবর্তী নীতিসমূহের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব সব থেকে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠী এবং গারোদের মধ্যে এবং এর ফলে তারা তাদের সম্পদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। গারোদের তাদের হতে বিচ্যুতকরণ সমস্যাটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রে তীব্রতা লাভ করে সরকারের বনবিবাগের কার্যক্রমের কারণে। যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল রাবার বাগান এবং জ্বালানী কাঠের বাণিজ্যিক উৎপাদন। গারোরা মূলতঃ কৃষক। গারোরা বাংলাদেশের উত্তরে ময়মনসিংহে এবং মধুপুর গড় অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। তারা জুম চাষের সঙ্গে সঙ্গে হাল চাষও করে তাকে। এর ক্রমসম্প্রসারণের পিচনে একদিকে যেমন ছিল পরিবেশগত চাপ তেমনি অন্যদিকে ছিল বৃদ্ধিমান জনসংখ্যার চাপ। ভূমি ছিল সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন এবং গারোদের ব্যাক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল না। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর মধুপুর গড় অঞ্চলের সকল বৃক্ষ আচ্ছাদিত উচ্চভূমি সরকার বনবিভাগকে হস্তান্তর করে। এছাড়া গারোদের রোপা ধান চাষের নীচু জমিগুলো নিয়ন্ত্রণের অধিকার অব্যাহত রাখে বনবিভাগ। ১৯৫৫ সালে মধুপুর গড় অঞ্চল সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৫৫ সালে জুম চাষ মধুপুর গড় অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং গারোদের বাধ্য হয়ে রোপা ধান চাষ করতে হয়। কিন্তু সেই রোপা ধান চাষ করার উপযুক্ত জমির প্রায় সবটুকু নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে গারোদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। যেসব গৃহস্থালীতে শ্রমশক্তি অধিক সংখ্যক ছিল বা যারা তাদের জমি অধিক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারত তারা অন্যদের তুলনায় ধনী হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু জুম চাষ পদ্ধতিতে ভূমিহীনতা ছিল অজানা এবং কেবলমাত্র জুম চাষ নিষিদ্ধকরণের কারণে গারোদের মাঝে ভূমিহীনতার সৃষ্টি হয়[৪৩]।

মধুপুরে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রশ্নহীনভাবে আদিবাসীদের জুমচাষ বন্ধ করে দেয়া এবং বনভূমির উপর আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার কেড়ে নেয়া প্রসঙ্গে খালেক (১৯৮৫) উল্লেখ করেছেন, ১৯৫১ সালে জমিদারী ব্যবস্থা বিলোপের পরে ১০০ বছরের জন্য মধুপুরের বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরাসরি আঞ্চলিক বন কর্মকর্তার কাছে অর্পন কারর কথা ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫২ সনে বন ব্যবস্থাপনার বন বিভাগের কাছে ন্যস্ত হয়। ১৯৫৫ সনে এই এলাকাকে ‘সংরক্ষিত বন’ ঘোষণা করা হয়। বন ব্যবস্থাপনা বনবিভাগের হাতে চলে যাওয়ার পর থেকেই এই বিভাগ ঝুম চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং গারোদেরকে ঝুম চাষ থেকে বিরত থাকতে বলে। জমিদার আমলে পাওয়া পত্তনী জমি ছাড়া অন্য সব জমিতে গারোদের অধিকার অগ্রাহ্য করা হয়। ১৯৫২-৫৩ সনের দিক থেকে ঝুমচাষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়[৪৪]। মধুপুরগড়ে বনবিভাগ কিভাবে বারবার বননির্ভর আদিবাসীদের কাছ থেকে প্রথাগত অধিকার কেড়ে নেয় এবং নানান অধিপতি উন্নয়ন প্রকল্প হাজির করে এ প্রসঙ্গে ইয়াসমীন (২০০৬) জানান, বনবিভাগ আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমিকে বরাবর রাবার বাগান-সামাজিক বনায়ন-ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে সংরক্ষিত বনভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে। বনভূমি গারোদের জীবনে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অনন্য ভূমিকা পালন করে। আদিবাসীরা বন থেকে বিভিন্ন বনআলু সংগ্রহ করে এবং এগুলোর শেকড় পরবর্তী বছরের জন্য লাগায় ও বাঁচিয়ে রাখে। বন থেকে আদিবাসীদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি সংগ্রহ করে। কিন্তু বর্তমানে তারা বন থেকে সংগ্রহ করতে বাধাগ্রস্থ হয়। বনবিভাগ টোল আদায় করে। কখনও কখনও বনরক্ষীদের মাধ্যমে তারা শারীরিক নির্যাতন এবং মিথ্যা বনমামলার ফাঁদে পড়ে। কারন বনবিভাগ গারোদের প্রথাগত বনঅধিকারকে অস্বীকার করে[৪৫]।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদিবাসীদের নিদারুন ভূমিহীনতার প্রসঙ্গে বাবুল (২০০৭) লিখেছেন, আদিবাসীরা যে হারে জমি হারাচ্ছে, সে হারে হারাতে থাকলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে, তা জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার

---

[৪৩] মোহসিন, আমেনা। মে ১৯৯৭। গারো জনগোষ্ঠী : মূলধারায় অন্তর্লীন ?, সমাজ নিরীক্ষণ : ৬৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ। পৃ. ৭২-৭৫

[৪৪] খালেক, কিবরিয়াউল। ১৯৮৫। মধুপুর গড়ের গারোদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা। প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে বিধি পিটার দাংগ সম্পাদিত স্মরণিকা থেকে। ‘উপজাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার ১৯৮৫ উপলক্ষ্যে এটি প্রকাশিত হয়। উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, নেত্রকোণা, পৃ.৩-৭

[৪৫] Yeshmin, Farhana and Rema, Rakesh. 2006, land rights and the eco-park, in the book *The Garos : struggling to survive in the valley of death* Edited by Prof. Dr. Mizanur RahmanRahman, (this publication prepared with funds by USAID and AED), ELCOP, Dhaka, p.157,171

প্রয়োজন পড়ে না। বিগত কয়েক বছরে অর্ধশতাধিক আদিবাসী গ্রাম নিশ্চিহ্ন হওয়ার মত ঘটনা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। ভারতের লোকসভার সাবেক স্পিকার মি. পি এন সাংমার পৈত্রিক গ্রাম টাঙ্গাইলের মধুপুরের জালালপুর আজ আদিবাসী শূন্য, পৃথিবীর প্রথম গারো বিশপ পনেন পল কুবির জন্মস্থান দেয়াচালা গ্রামেও আর কোনো আদিবাসী নেই[৪৬]। একটা সময় পর্যন্ত শেরপুর-ময়মনসিংহ-জামালপুর এলাকার মেঘালয় পাহাড়ের সীমান্তের ডালু জাতির বেশ স্বনির্ভর সভ্যতা ছিল। কিন্তু কালে কালে সেই স্বনির্ভরতা বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। মূলতঃ কৃষিজীবী ডালুরা বর্তমানে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়েছেন। বাংলাদেশের ডালু বইতে রায় ও অন্যারা (২০০৯) ডালুদের ভূমি সমস্যার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মূলতঃ ১৯৪৩, ১৯৫০, ১৯৬৪ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ডালু জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে তারা মনে করে। এই সময় গুলোতে ডালুদের যুগ যুগ ধরে ভোগদখল করে আসা জমির অধিকাংশই দখল হয়ে যায়[৪৭]।

বৃহত্তর সিলেট ও হাওর অঞ্চল

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের চাবাগান গুলোতে বসবারত আদিবাসীদের ভূমি অধিকার অনিশ্চিত। এছাড়া খাসিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, মৈতৈ মণিপুরী, লালেং, জৈন্তিয়া, ত্রিপুরীসহ হাওর ও মেঘালয় সীমান্তবর্তী হাজং-খাসিয়া-বানাই-বর্মণ আদিবসীদেরও টিলাভূমি এবং হাওর জলাভূমিতে কোনো সর্বজনীন প্রথাগত অধিকার নেই। লামিন (২০০৯) বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বৃহত্তর সিলেট বিভাগের বিভিন্ন খাসিয়া পুঞ্জির ভূমি সমস্যা বিষয়কে ব্যাখা করার জন্য লিখেছেন, ...অন্যান্য সমতলের আদিবাসীদের মতো খাসিয়াদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভূমি। বংশপরম্পরায় ওই এলাকায় বসবাস করার পরও আজ তারা নিজ বসতভিটা ও ভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। প্রভাবশালীদের ভয়ভীতি, জোরপূর্বক দখল, প্রশাসনের অসহযোগিতা এবং অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে এসব জোরপূর্বক জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে প্রতিনিয়ত[৪৮]। পানজুমিয়া খাসিয়াদের ভূমি সমস্যার বিষয় গুলো নিয়ে পতাম (২০০৫) তার বইতে লিখেছেন, ...খাসিয়াদের প্রধান সমস্যা হলো ভূমি সমস্যা। শতকরা ৭০ ভাগই খাসিয়াদের নিজস্ব কোন ভূমি নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু উদ্যোগ ব্যতীত চাষকৃত বা দখলকৃত ভূমির সিংহভাগ হলো বিভিন্ন মালিকানাধীন ভূমির অংশ থেকে বন্দোবস্ত নেওয়া বা সরকারী খাসভূমি এবং কিছু অংশ বনবিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খাসিয়াদের জন্য বরাদ্দকৃত বনভূমি। সরকারী খাস ভূমির বন্দোবস্তর ক্ষেত্রে বরাদ্দকরণে নানাবিধ সমস্যার কারণে খাসিয়ারা এসব দখলকৃত ভূমির মালিকানা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ভূমি বন্দোবস্ত ও বরাদ্দকরণে হয়রানী ও নাজেহাল হতে হচ্ছে[৪৯]। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের খাসিয়ারা কিছু ব্যাতিক্রম বাদে মূলতঃ বনবিভাগ বা চাবাগান থেকে আইনগতভাবে জমি লীজ নিয়ে পান-লেবু-সুপারি-ফলফলাদি জুম-আবাদ করে বসবাস করেন। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের এক বিশাল অংশের ভূমি-উত্তরাধিকার খাসিয়ারা হলেও আজ খাসিয়ারা সেই ভূমিতে ভূমিহীন। প্রশ্নহীনভাবে খাসিয়াপুঞ্জি (গ্রাম) উচ্ছেদ হচ্ছে, খাসিয়া জনপদে গড়ে তোলা হচ্ছে কর্পোরেট পুরুষতান্ত্রিক পর্যটন বাণিজ্য, পাথর বাণিজ্য ও প্রতিবেশবিনাশী ইকোপার্ক।

সিলেটের খাদিম পাহাড়ের খাদেম (তত্ত্বাবধায়ক) নিজেদের মনে করে লালেং জাতি। হযরত শাহজালাল (রঃ)সহ ৩৬০ আউলিয়ার বাংলাদেশে আগমন এবং 'ইসলাম প্রচার' লালেংদের জন্য নিজস্ব ভূমি অধিকারহীনতা হিসেবে দেখা দেয়। লালেং ভূমিতেই গড়ে উঠতে থাকে মাজারের পর মাজার, চা চাষের জন্য জবরদস্তি করে কেড়ে নেয়া হয় আদিবাসী লালেংদের সীমানা, পরবর্তীতে সিলেট সেনানিবাস এবং ওসমানী বিমানবন্দরের জন্য লালেংদের গ্রাম প্রশ্নহীনভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। সিলেট সদর উপজেলায় লালেং গ্রাম সমূহ থাকায় পরবর্তীতে সিরামিকস কোম্পানি এবং বিভিন্ন পর্যটন ও বিনোদনকেন্দ্র মালিক নানানভাবে লালেংদের সকল জায়গা জমি দখল করতে থাকে। তীব্র ভূমি অধিকারহীনতার ভেতর মাত্র ৩৫০০ লালেং বাংলাদেশের সিলেট খাদিম পাহাড়ে টিকে থাকবার লড়াই করছে। লালেংদের (যদিও রেখক

---

[৪৬] নকরেক, বাবুল ডি। ২০০৭, বৃহত্তর ময়মনসিংহে আদিবাসীদের ভবিষ্যত ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ, আর্ন্তজাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন (বাগাছাস)-ঢাকা মহানগর শাখার বিশেষ প্রকাশনা চিরিং থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, চিরিং সম্পাদনা করেছেন পিন্টু হাউই, ঢাকা, পৃ. ১২

[৪৭] রায়, অভিজিৎ; আলী, মো. এরশাদ ও সেন, সুকান্ত। ২০০৯, বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ১১৯

[৪৮] লামিন, সিলভানুস। ২০০৯, বিপন্ন খাসি সমাজ, বিপন্ন খাসি সংস্কৃতি-ভাষা, জৈন্তিয়া-খাসিদের অন্যতম সামাজিক উৎসব হকতই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা 'হকতই' থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, সজল স্বার্তীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশ করেছে সিলেট জৈন্তাপুরের খাসিয়া সেবা সংঘ, পৃ. ৪১

[৪৯] পতাম, রুশ। ২০০৫, খাসিয়া জনগোষ্ঠী : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, সিলবানুস লামিন কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা, পৃ.১৮৪-১৮৫

লালেংদেরকে পাত্র নামেই পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু লালেংরা নিজেদেরকে লালেং নামেই পরিচয় করান) সম্পর্কে এথনোগ্রাফ জাতীয় সমীক্ষাগ্রন্থে চক্রবর্ত্তী (২০০০) লিখেছেন,

…….পাত্রদের চেয়ে দরিদ্র কোনো সম্প্রদায় বাংলাদেশে অবস্থান করছে না বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিকভাবে সম্পদের নূন্যতম তাদের অধিকারে নেই। কে উ কেউ মনে করে যে বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে ভূমি-অধিকার হারিয়ে ফেলার জন্য পাত্রদের এই দুরবস্থা। পাত্রদের দরিদ্র হবার পেছনে একমাত্র কারন হল তাদের ভূমি হস্তান্তর। অতীতে অধিকাংশ পাত্রই কমবেশি ভূমির মালিক ছিল অথবা বেশ কিছু পরিমাণ ভূমি তাদের সকলেরই অধিকারে ছিল। কালক্রমে তারা এই ভূমি অধিকার হারিয়ে ফেলে যার সূচনা হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে চা-চাষ এর শুরুতে। ইউরোপীয় চা-করগণ পাত্রদের বসতি পাহাড় ও টিলাসন্নিহিত অঞ্চল চা-চাষের জন্য বেছে নেয় এবং জবরদখলের মাধ্যমে পাত্রদের উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করে তাদের কর্তৃত্ব। পাত্রদের মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ যাদের প্রায় সকলেই দিনমজুর হিসেবে কাজ করে। ঔপনিবেশিক আমলে চা-চাষের সূচনায় পাত্রদের ভূমি নিয়ন্ত্রণের যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে তাদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ বেশি প্রভাবিত হয়েছে পরবর্তীকালে বাঙালি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে[৫০]।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এক সমীক্ষায় হাই (২০০৭) দেখিয়েছেন, একটা সময়ে লালেংরা অনেক জমির মালিক হলেও কালক্রমে জমি হারিয়ে বর্তমানে তারা ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়েছে[৫১]। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে ৩১০ পরিবার পাত্রদের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় চক্রবর্ত্তী (২০০০) দেখিয়েছিলেন, পাত্র সম্প্রদায়ের ৩০.৬১ % পরিবার ভূমিহীন[৫২]। সেন ও অন্যারা (২০০৭) লালেংদের ভূমি দখলের পিছনে বহিরাগত প্রভাবশালী বাঙালিদের দায়ী করে বলেছেন, সিলেট অঞ্চলে পাত্রদের কাছ থেকে আধ কেয়ার (১৫ শতক) জমি ক্রয় করার সময় আট কেয়ার (২৪০ শতাংশ) জমি লিখে নেয়া বাঙালিরা[৫৩]।

ভাওয়ালগড় অঞ্চল

আচার্য ও অন্যারা (২০০৭) ভাওয়াল গড়ের আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রসঙ্গে একটি উদাহরন টেনে বলেন, সেটেলমেন্ট অফিসের এস এ রেকর্ড থেকে দেখা যায়, গাজীপুর জেলার কৌচাকুড়ি মৌজার প্রায় ৫টি গ্রামে ৪৪টি আদিবাসী পরিবার ছিল। এদের মধ্যে বর্তশানে মাত্র ১৩টি পরিবার বসবাস করছে অন্যরা স্থানন্তরিত হয়েছে। এই পরিবারগুলির গড়ে প্রায় পাঁচ একর করে জমি ছিল অথচ বর্তমানে অধিকাংশই ভূমিহীন এবং কারোরই এক একরও জমি নেই[৫৪]। আচার্য ও অন্যান্যরা (২০০৭) ভাওয়ালগড়ের আদিবাসীদের ভূমিহীনতা প্রসঙ্গে আরো জানান, গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের আওতাধীন রামচন্দ্রপুর, কেন্দুয়ার বাইত গ্রামগুলোতে একসময় বংশী(বর্মণ) আদিবাসীদের প্রাধাণ্য ছিল। কালিয়াকৈর উপজেলার চাবাগান গ্রামে ৫০টি বৌনা/বুনো পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে কয়েকশ বছর ধরে এই এলাকার জমি ভোগ দখল করে আসছিল। তাদের কোনো রেকর্ডকৃত জমি ছিল না। এগুলো মূলতঃ মৌখিকভাবে বিলিবন্টকৃত জমি। কিন্তু বিগত কয়েকবছর ধরে সমতলের এই আদিবাসীরা তাদের ভোগদখলে থাকা জমি জমা হারিয়ে নিঃস্বপ্রায়। এর ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে পরিবর্তন। গাজীপুর জেলার আদিবাসীদেরকে বিগত পাঁচ দশকে ৯৪% ভূমি হারাতে হয়েছে[৫৫]।

---

[৫০] চক্রবর্ত্তী, ড. রতন লাল। ২০০০। সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৬১

[৫১] Hye, Muhammad Abdul. 2007, The Laleng community of Sylhet, JASHIS, Sylhet, p.44

[৫২] চক্রবর্ত্তী, ড. রতন লাল। ২০০০। সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৬০

[৫৩] সেন, সুকান্ত; রায়, অভিজিৎ ও লামিন, সিলভানুস। ২০০৭, সমতলের আদিবাসী : অধিকার ও অধিকারহীনতা, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৯৭

[৫৪] আচার্য, জয়ন্ত; বর্মণ, পিযূষ; চক্রবর্তী, বিভাষ এবং সিকদার, সৌরভ। ২০০৭, আদিবাসীদের ভূমি হারানোর কারণ এবং সামাজিক জীবনে এর প্রভাব : প্রেক্ষিত গাজীপুর জেলা, অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ঢাকা, পৃ.৭০

[৫৫] আচার্য, জয়ন্ত ও বর্মণ, পিযুষ। ২০০৭। আদিবাসীদের ভূমি হারানোর কারন এবং সামাজিক জীবনে এর প্রভাব : প্রেক্ষিত গাজীপুর, অক্সফাম জিবি-বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৬০-৭০

চা বাগান অঞ্চল

কি পার্বত্য চট্টগ্রাম, সমতল অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূল সব অঞ্চলের আদিবাসীদের আলোচনায় খুব সাবধানে এড়িয়ে যাওয়া হয় বাংলাদেশের চা বাগানে বসবারত এক বিশাল আদিবাসী অধ্যায়কে। যাদের কিছু অংশ চাগানের চাশ্রমিক হলেও অধিকাংশেরই কোনো ভূমি বা জীবিকা নিরাপত্তা নেই। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, পাহান, মাহালী, কোল, ভূমিজ, খাড়িয়া, দেশোয়ালী, কুর্মী, সিং, পাহাড়ি, রাজোয়ার, মাদ্রাজী, নেপালি, আসামী এরকম পরিসংখ্যানহীন প্রায় দশ লাখ আদিবাসী জাতির বাস দেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের চাবাগন গুলোতে। যাদের সাথে লালেং ও ভূমিউদ্বাস্তু মান্দিদের এক বড় বসবাস করছে। ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে চাবাণিজ্যের জন্য মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভারতের ক্ষুধা ও দূর্ভিক্ষ পীড়িত আদিবাসীদের ‘গাছ ছিলালে রূপিয়া মিলে..’ বলে আদিবাসীদের এক ব্যাপক অংশকে চাবাগানের চুক্তিবদ্ধ দাসশ্রমিক বানানো হয়। বাংলাদেশের চা বাগানে আদিবাসীদের আগমন সম্পর্কে ভুঞা (২০০৩) জানিয়েছেন, ১৮৭১ সালে মাত্র ১০ বৎসরে ৭১,৯৫০ জন চা শ্রমিক আমদানী করা হয় এবং পরবর্তী ১০ বৎসর দ্বিগুন অর্থাৎ ১,৪৯, ৬৫০ জন শ্রমিক আমদানী করা হয়। ১৯০১ সালে ১,৪৪,৮৭৬ জন আমদানীকৃত চা শ্রমিকদের মধ্যে ভারতের ছোট নাগপুর হতে ২২,৭৪৫ জন এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে ২২,০৬৭ জন, যুক্তপ্রদেশ হতে ৪১,১৬৯ জন চা শ্রমিক আমদানী করা হয়েছিল[৫৬]। গিরমিটি বা আজীবন দাসত্ব চুক্তির মাধ্যমে আসা চাশ্রমিকদের অধিকাংশই আজ আর চা বাগানের শ্রমিক নন, রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত স্থায়ী ভূমি বরাদ্দ করতে পারেনি চাবাগানিয়াদের জন্য। চাবাগান মালিক, স্থানীয় প্রভাবশালী বাঙালি, বনবিভাগ, এমনকি খাসিয়া পুঞ্জির সাথে এ নিয়ে চাশ্রমিকদের প্রশ্নহীন ভূমি বিরোধ টিকেই আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পৃথিবীর সবচে বড় একক ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী মুন্ডা, মাহাতো, বাগ্দীরাও অন্যান্য এলাকার মতই এক ভূমিহীন অবস্থা পাড়ি দিচ্ছেন। বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক ভূমি দখল ও নানান কৌশলে আদিবাসী ভূমি কেড়ে নেয়ার পাশাপাশি আশির দশক থেকে যুক্ত হয়েছে কৃষিজমিতে প্রশ্নহীন কর্পোরেট চিংড়ি বাণিজ্যের ঘের। চিংড়ি ঘেরের ফলে আদিবাসীদের কৃষিজমি নানানভাবে জোরজবরদস্তি করে কেড়ে নেয়ার মতই এক সাধরন চল চালু আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। দাস (২০০২) এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, মহারাজা বীর মানিক্য ১৯৩১ ও ১৯৪৩ সালে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য যে জমি সংরক্ষণ করে গিয়েছিলেন, আবাদ গড়ার কাজ শেষ করে তাদের কিছু লোক সে জমিতেই থেকে যায়। জমিদারদেরা তাদের এমনভাবে জমি দান করেছিলেন যে, সে জমি বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল ফলে মুন্ডাদের জমি আর নাম পত্তন হয়নি। ধীরে ধীরে সহজ সরল নিরক্ষর এই মুন্ডারা স্থানীয় শোষক মাতব্বর শ্রেণীর হাতে নির্যাতিত হতে থাকে এবং মাতব্বর শ্রেণীরা মুন্ডাদের সরদার উপাধি দিয়ে জমি জায়গা এমনকি ভিটে পর্যন্ত নিজের নামে লিখে নেয়[৫৭]। সুধাংশু (২০০৫) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডাদের ভূমিহীনতা সম্পর্কে আরো জানান যে, একসময় যে মুন্ডারাই কেবল সুন্দরবন সংলগ্ন আবাদী জমি তৈরি করে চাষাবাদের প্রবর্তন করেছিল আজ সেই মুন্ডাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব কোনো জমি নেই। তারা পরের জমি অথবা খাস জমিতে বসবাস করে[৫৮]।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ দেশের সমতলের আদিবাসীদের ভূমিহীনতার বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের মাঝে কোনো সন্দেহ নেই। আদিবাসীদের এই ভূমিহীনতার কাহিনীর ঐতিহাসিকতা আছে, ভূমিরক্ষায় আদিবাসীদের রয়েছে দীর্ঘ শ্রেণীবিপ্লবের অবিস্মরণীয় সব আখ্যান। আমরা আলাপের এই পর্যায়ে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমিহীনতার কিছু সুস্পষ্ট কারন এবং জাতীয়ভাবে মনোযোগ তৈরী হওয়া ভূমি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত কিছু ধারণা তুলে ধরছি।

---

[৫৬] ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : আধুনিক যুগ ব্রিটিশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ. ৪২

[৫৭] দাস, মিলন। ২০০২, আদিবাসী মুন্ডাদের জীবন-বৈচিত্র্য, পরিত্রাণ, সাতক্ষীরা

[৫৮] মল্লিক, সুধাংশু। ২০০৫, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিাঞ্চলের মুন্ডা সম্প্রদায়ের চালচিত্র, সাপ্তাহিক ২০০০, সংখ্যা ৪৬, ঢাকা

সমতল অঞ্চলের আদিবাসী ভূমির রক্তাক্ত দ্রোহী গাথা

কুঞ্জের ঘারকার
বুড়হা বুড়হি
আজো বন্দি
বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ
মানকা আওধি।
এই গৃহের আদি দেবতা/বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাকে বন্দনা করেছে/আমরাও তাদের বন্দনা করছি,/
পূর্ব পুরুষেরা যাকে মেনে এসেছে/ আমরাও তাকে মেনে আসছি[৫৯]।
(সোহরাই পরবের একটি ওঁরাও মন্ত্র)

অদ্রি চিসিম ও অংশু চিসিম
আমরা দুই সন্তানকে
যারা শিশু বয়সে অজান্তেই গারো পাহাড়ে ওদের জন্মভূমি দেশ হারিয়েছে, মেননেং নদীর কূলে
পূর্বপুরুষের জায়গা-জমি-গ্রাম হারিয়েছে। আদিবাসী গান-নৃত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য জগত হারিয়েছে[৬০]।

আদিবাসীরা ঐতিহাসিকভাবে ভূমির সামাজিক মালিকানায় অভ্যস্থ। ভূমি ও সম্পদের ব্যাক্তিগত মালিকানার চাপ আদিবাসীদের উপর প্রশ্নহীনভাবে চাপিয়েছে রাষ্ট্র। ভূমির চিহ্নিতকরণের জন্য দলিল দস্তাবেজের মত কাগজ ও নথি সংরক্ষণের অভ্যাসও অধিকাংশ আদিবাসী এলাকায় কোনো সাধারন চল হয়ে দাঁড়ায়নি। ভূমিকেন্দ্রিক আদিবাসীদের পারস্পরিক দার্শনিক ভিত্তি যা বরাবর ভূমির সচলতা এবং পরিবর্তনশীলতার প্রতি সম্মান জানায় এবং ভূমিকে জীবনের এক অমর অস্তিত্ব মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র বা বাঙালি বা বনবিভাগের ভূমির প্রতি বিশ্বাস ও দর্শনের সাথে আদিবাসী এই ভূমি দর্শনের রয়েছে বিস্তর ফারাক। আর ভূমির প্রতি এই দর্শনগত বিরোধই আদিবাসীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ভূমি ছিনিয়ে নেয়াকে বাঙালি জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র একটি 'সাধারন' ঘটনা মনে করে। আদিবাসীরা দীর্ঘদিন যাবত নিজস্ব ভূমির প্রথাগত মালিকানাতেই অভ্যস্থ ছিলেন এবং পরবর্তীতে ভূমির রাষ্ট্রীয় জরিপ ও রেকর্ড শুরু হলে আদিবাসীদের জমি ভুল ভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে যতটুকু জমি আছে তার চাইতে অনেক কম বা আদিবাসীর জমি অন্য কোনো বাঙালির নামে রেকর্ড করা হয়। আদিবাসীরা যখন চাপে পড়ে নিজস্ব জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন তখনও দেখা যায় আদিবাসীরা জমির ন্যায্য দাম পান না। অনেকক্ষেত্রেই যতটুকু জমি বিক্রি করেন একজন আদিবাসী কিন্তু ক্রেতা বাঙালি হলে তিনি কৌশলে সেখানে আরও বেশী জমি লিখিয়ে নেন। মহাজন, ঋণগ্রহীতা এবং চলতিসময়ের ক্ষুদ্রঋণব্যবসায়ী এনজিওদের মাধ্যমেও আদিবাসীরা জমি জিরাত বন্ধক রাখতে বাধ্য হন, কিন্তু পরবর্তীতে ঋণের টাকা শোধ করেও আর কখনোই জমি ফিরে পান না বলে অনেকেই জানিয়েছেন। বহিরাগত বাঙালিরা নানান সময়ে আদিবাসী অনুষ্ঠান, পূজা এবং সামাজিক উৎসবে এসে সমস্যা করে এবং গ্রামীণ সাধারন ঘটনা সমূহই একপর্যায়ে আদিবাসী-বাঙালি বিরোধে রূপ নেয় এবং এর ফলশ্রুতিতে বাঙালিরা পরবর্তীতে দলবলসহ আদিবাসী গ্রাম দখল করে। আদিবাসীদের এলাকায় বাণিজ্যিক তামাক-ভূট্টা-হাইব্রিড চাষ, বাণিজ্যিক মৎস্যখামার, বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের, বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা এক 'সাধারন ঘটনা'। প্রাকৃতিক বনভূমি এবং বনর্ভির আদিবাসীদের জীবন ও ভূমি অধিকার বিপন্ন করে শেরপুরের গজনীতে তৈরী করা গজনী অবকাশ যাপন কেন্দ্র, টাঙ্গাইলের মধুপুর ইকোপার্ক, মৌলভীবাজারের মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, খাগড়াছড়ির আলুটিলা গুহা, দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী, সিলেটে লালেং আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে জাকারিয়া সিটি ও জাফলং-এ গড়ে তোলা হয়েছে বাণিজ্যিক বিনোদন কেন্দ্র।

রায় ও অন্যান্যরা (১৯৪৩) জানান, দেশভাগ ও নানান সময়ে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসমূহও আদিবাসী ভূমিহীনতার এক অন্যমত কারন। মূলতঃ ১৯৪৩, ১৯৫০, ১৯৬৪ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের

---

[৫৯] জলিল, ড. মহম্মদ আবদুল। ১৯৯৯, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য : ওরাওঁ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, পৃ. ৮৩

[৬০] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০১, বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। বইটির উৎসর্গ পৃষ্ঠায় নিজের সন্তানদের বইটি উৎসর্গ করতে যেয়ে লেখক আদিবাসীদের স্বনির্ভর সভ্যতা ও আপন ভূমি হারানোর বেদনা চেপে রাখতে পারেন নি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ডালু জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে তারা মনে করে। এই সময় গুলোতে ডালুদের যুগ যুগ ধরে ভোগদখল করে আসা জমির অধিকাংশই দখল হয়ে যায়[৬১]।

আদিবাসী ভূমি দখলের একটি প্রধান পক্ষ বাংলাদেশ বনবিভাগ। বনবিভাগের সাথে বননির্ভর আদিবাসীদের রয়েছে ঐতিহাসিক অমীমাংসিত বিরোধ। বনবিভাগের কোনো কর্মসূচিই আদিবাসীদের পূর্ব অনুমতি ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয় না। যেমন, সামাজিক বনায়ন, যা তৈরি হয়েছে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের নির্দেশে। দেশের প্রাকৃতিক বনভূমি উজাড় করে প্রাকৃতিক বনভূমি নির্ভর আদিবাসীদের তাড়িয়ে বনবিভাগ এই প্রতিবেশবিনাশী সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এডিবির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের 'ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যান করা হয়েছে যা এজেন্ডা-২১, আন্তর্জার্তিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ এবং আদিবাসী অধিকারের জায়গা থেকে 'প্রাইওর ইনফরমড কনসেন্ট' নয়[৬২]। সরেন (২০০৬) এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার এক প্রধান কারন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বনবিভাগের প্রশ্নহীন সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে। তিনি জানান, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, রাজোয়ার, তুরি, কর্মকার, মালো, মাহাতো, মালপাহাড়িয়া, গন্ড, পাটনি, বাগদি, মাহালী, মুসহর, কোলকামার, ভুঁইমালি, কোচ, তেলী, গোড়াত, চাঁই, বাইছনী, লহরা, হাড়ি, ঘাটোয়াল, দোষাদ, চাড়াল, ডহরা, ভূমিজ, আঙ্গুয়াররাজোয়াড, বেতিয়া, নুনিয়াহাড়ি, রাজবংশী, পাহাড়িয়া, ভুঁইয়া, বাগদী, রবিদাস, রাই, বেদিয়াসহ প্রায় ৩৮টি জাতিসত্তার প্রায় ১৫ লাখেরও বেশী আদিবাসী বসবাস করেন। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক(এডিবি) এর সহায়তা ও পরিকল্পনায় তথাকথিত সামাজিক বনায়নের নামে বাংলাদেশ বনবিভাগ[৬৩] দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, বিরল ও বীরগঞ্জ উপজেলার আদিবাসীদেরকে জন্মমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

আমরা দরকার হলে এখানেই মরব কিন্তু জমি ছাড়ব না।
আমরা এখানে এমন খনি চাই না যা আমাদের উচ্ছেদ করবে[৬৪]।

উপরের বক্তব্যটি রীনা টুডুর। দিনাজপুরের বড়বুকচি গ্রামের সাঁওতাল কৃষাণী রীনা টুডুর (৪৫) চাষের জমি ২০ বিঘা এবং বসতবাড়ি ও ধানের জমি মিলিয়ে আরো ৫ বিঘা জমি আছে। এ জমিই তার জীবন জীবিকার একমাত্র উৎস। রাষ্ট্র যখন কর্পোরেট এশিয়া এনার্জীকে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের প্রশ্নহীন অনুমতি দিয়েছিল তখন রীনা টুডুর মত অনেকেই বুকের রক্ত দিয়ে রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আদিবাসীরা উন্মুক্ত কয়লা উত্তোলনের নামে ফুলবাড়ি, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর উপজেলার ৬৭টি আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ করা চলবে না[৬৫] বলে সংগঠিত করেছেন দেশীয় সম্পদ ও আপন ভূমি রক্ষার এক জোরদার প্রতিরোধ। ব্রিটিশ কর্পোরেট খনি কোম্পানি এশিয়া এনার্জি দিনাজপুরের ফুলবাড়ি-পার্বতীপুর-নবাবগঞ্জ-বিরামপুর উপজেলার মহেশপুর, বীরটলা, চকচকা, পাটিকাঘাট, পাঁচপুকুরিয়া, গারোপাড়া, গিরিবরপাড়া, কৈবুরচাঁদ, ঘোড়াপাথর, ধানজুড়ি, সগলে, চন্ডিপুরসহ প্রায় ৬৭টি গরিষ্ঠভাগ সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম-প্রাকৃতিক জলাভূমি, গ্রামীণ বন, কৃষিজমি ও স্থানীয় সভ্যতাকে খুন করে কয়লা বানিজ্যের জন্য প্রতিবাদী মিছিলে

---

[৬১] রায়, অভিজিৎ; আলী, মো. এরশাদ ও সেন, সুকান্ত। ২০০৯, বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ১১৯

[৬২] Roy, Raja Devasish. 2005. Perspectives of Indigenous peoples on the review of Asian Development Bank's Forest Policy, এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ৯ আগস্ট ২০০৫ সালের আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা 'সংহতি' নামের স্মরণিকা থেকে নেয়া হয়েছে। পৃ. ৫৯-৬৬

[৬৩] সরেন, রবীন্দ্রনাথ। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী : ভূমি সমস্যা জীবনের সংকট। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫১তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫১ তম বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হুল নামের স্মরণিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেছেন পাভেল পার্থ, হিরণমিত্র চাকমা, সিলভানুস লামিন এবং জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, বাংলাদেশের ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে ৩০ জুন ২০০৬, পৃ. ২৩-২৫

[৬৪] গাইন, ফিলিপ। ২০০৬, দিনাজপুরে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন প্রকল্প : অনেক মুনাফার হাতছানি, খীসের বিনিময়ে মোটা মুনাফা? কে হবে বেশি লাভবান? কার হবে বেশি ক্ষতি?, শেড প্রকাশিত ধরিত্রী পত্রিকা থেকে প্রতিবেদনটি নেয়া হয়ছে, ধরিত্রী সম্পাদনা করেছেন ফিলিপ গাইন, শেড, ঢাকা, পৃ. ২

[৬৫] ৭ জুন ২০০৬ তারিখে দিনাজপুর প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ আদিবাসী সমিতি, দিনাজপুর জেলা আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন সমিতি, ভূমি অধিকার বাস্তবায়ন কমিটি ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদ যৌথভাবে 'আদিবাসীদের জীবনের সংকট ও দাবি উত্থাপন উপলক্ষ্যে যে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেখানে ১১ দফা দাবি উত্থাপিত হয়। এটি সেখানকার এক প্রধান দাবি।

প্রশ্নহীনভাবে গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। ফুলবাড়ি এলাকাকে কয়লাখনির নামে এশিয়া এনার্জির হাতে তুলে না দেয়ার জন্য আবারো সাঁওতালদের বুকের কলিজা পেতে এই ঐক্যবদ্ধ দাঁড়ানো হুলের ঝিলিকেরই উত্তরাধিকার[৬৬]। কাকতালীয়ভাবে দেশের প্রায় সবগুলো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাতেই যেমন আদিবাসীদের বসবাস তেমনি আদিবাসী অঞ্চল গুলোই কয়লা-গ্যাস-তেল-প্রাণসম্পদে ভরপুর। আর এই সম্পদ ছিনতাই করতেই ইউনোকল, অক্সিডেন্টাল, শেভরন, এশিয়া এনার্জী, শেল, নাইকোর মতো কর্পোরেট কোম্পানিরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে বারবার হামলা চালাচ্ছে আদিবাসী জনপদে। কর্পোরেট জীবাশ্ম জ্বালানি খনন এবং উত্তোলনের ফলে আদিবাসীরা নিজস্ব ভূমির অধিকার হারাচ্ছে দিনকে দিন। সেই দিনাজপুরের ফুলবাড়ি থেকে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া বনের ভেতর।

আদিবাসী ভূমি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই আদিবাসী ভূমিতে সামরিক স্থাপনার কথা উল্লেখ করেন। সিলেটের লালেং ভূমিতে তৈরী হয়েছে সিলেট জালালাবাদ সেনানিবাস এবং ওসমানী বিমানবন্দর, মধুপুর শালবনের ভেতর মান্দি আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ করে তৈরী করা হয়েছে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং ও বোম্বিং রেঞ্জ। দিনাজপুরে আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ করে তৈরী করা হয়েছে পল্লী বিদ্যুত কেন্দ্র, দিনাজপুরের নসিপুরে আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ করে তৈরী করা হয়েছে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। চাকমা (২০০৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে সেনাবাহিনী কর্তৃক আদিবাসী ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে বলেছেন, বান্দরবানের লামার সরই ইউনিয়নের মুরুংদের জুম এলাকাসহ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ভূমি বেদখল অব্যাহতভাবে চলছে এবং অত্যন্ত সূক্ষ পরিকল্পনা মোতাবেক বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এখনো সেনাশাসন জারী রাখা হয়েছে এবং নানা অজুহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় খাগড়াছড়ির লেমুছড়ি, গামাড়ীঢালা, জয়সেন কার্বারীপাড়া ইত্যাদি এলাকায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমির উপর শত শত ঘরবাড়ী নির্মাণ করে জবরদখল করেছে। সামাজিক বনায়নের নামে সরকার ১৯৮৯ সালে বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার ৮৩টি মৌজার ২ লাখ ১৮ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে। একই সঙ্গে বান্দরবানে আর্টিলারি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের জন্য সাড়ে ১১ হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বান্দরবানের রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের জন্য ৯ লাখ ৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব পদক্ষেপের ফলে প্রায় এক লাখ আদিবাসী নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে[৬৭]।

বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক এবং গণমাধ্যমেও ইতিবাচকভাবে আদিবাসীদের উপস্থাপন করা হয় না। যে শিশু বয়সে একজনের মনোজগত তৈরী হতে থাকে সে বয়সেই আদিবাসীদের সম্পর্কে একটা 'ভুল' এবং বিরোধপূর্ণ অপর ধারণা নিয়ে বড় হতে বাধ্য হয় এদেশের বাংলা মাধ্যমে পাঠরত জনগণ। আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার প্রসঙ্গগুলো কোনোভাবেই শিক্ষা পাঠ্যক্রমের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। গণমাধ্যমে আদিবাসী ভূমি সমস্যা এবং ভূমি বিরোধের পূর্নাঙ্গ বিবরণ ও চিত্র সবসময় পাওয়া যায় না।

সমতলের আদিবাসীদের ভূমিহীনতার ক্ষেত্রে আদিবাসী পুরুষদের চেয়ে আদিবাসী নারীদের অবস্থা অনেক বেশী প্রান্তিক। সমতলের আদিবাসীদের ভেতর মান্দি, খাসিয়া ও লেঙাম যে মাতৃসূত্রীয় সমাজ গুলোতে ভূমির উপর নারীর বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে সেসব সমাজেও নারীরা ক্রমান্বয়ই ভূমিহীনে পরিণত হতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া অপরাপর পিতৃসূত্রীয় আদিবাসী সমাজ গুলোতে ভূমিতে নারীর মালিকানার অধিকার তেমন না থাকলেও নারীর সার্বিক সম্পর্ক ভূমিকে ঘিরেই। দেখা যায় ভূমিসমস্যার ক্ষেত্রে সমতলের বঞ্চিত আদিবাসী নারীরা ক্রমান্বয়েই প্রান্তিক থেকে আরো প্রান্তিকতার পর্যায়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। নিজস্ব জীবিকা থেকে উদ্বাস্তু আদিবাসী নারীর গন্তব্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিনমজুরী এবং অচেনা শহর। আদিবাসী এলাকাতেও নারীরা নিরাপদে নেই, বহিরাগত বাঙালিদের দ্বারা আদিবাসী নারীর উপর ধর্ষণ-হত্যাসহ নানান নিপীড়ন চলছেই এবং এর প্রতিটির সাথে যুক্ত রয়েছে আদিবাসী পরিবারটির ভূমিকে বেদখল করার মতলব। আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ত্রিপুরা (২০০৩) জানিয়েছেন, ভূমি বা সম্পদের অধিকার কোনোভাবেই আদিবাসী নারীর

---

[৬৬] পার্থ, পাভেল। 'কয়লা উপনিবেশের বিরুদ্ধে হুল গর্জে উঠুক আবার। দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৪ জুলাই ২০০৬

[৬৭] চাকমা, মঙ্গল কুমার। ২০০৫, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা। এই প্রবন্ধটি বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ৯ আগস্ট ২০০৫ সালের আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা 'সংহতি' নামের স্মরণিকা থেকে নেয়া হয়েছে। পৃ. ১৮-২৬

কোনো নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়নি[৬৮]। হালিম (২০০৭) জানিয়েছেন, আদিবাসী নারীর প্রান্তিক পরিস্থিতি আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন সমূহের শর্তকে বারবার লংঘন করছে[৬৯]। দারিং (২০০৬) জানিয়েছেন, ভূমি অধিকার হারয়ে আদিবাসী মান্দি নারীরা সমাজে আরো বেশী প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন যা কখনোই কাম্য ছিল না[৭০]। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের প্রতি মনোযোগ রেখে হালিম (২০০৩) জানিয়েছেন, আদিবাসী নারীরা এক বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে সার্বিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বারবার[৭১]। ফারিবা (২০০৫) মধুপুরের মান্দি নারীর ভূমিহীনতা এবং এর চলমান পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ভূমির অধিকার হারিয়ে বিপুল সংখ্যক মান্দি নারীদের শহরে অভিবাসন ঘটছে[৭২]। কৃষি থেকে উদ্বাস্তু এসব মান্দি নারীর শেষ ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা শহরের বিউটি পার্লার, ঠিক যেমন কৃষিজীবন থেকে উদ্বাস্তু বাঙালি নারীর অনিবার্য আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্পোরেট গার্মেন্টস। টুকু (২০০৫) আদিবাসী নারীর ভূ-সম্পদের লড়াইকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, ১৯৪৬ সাল থেকে ভূ-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দেশভাগের পর থেকে যে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম গারো পাহাড়ের পাদদেশে নেত্রকোণার টংক আন্দোলনের নেত্রী রাশিমনি হাজং এবং তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র আর স্বাধিকার আন্দোলনে আমাদের জুম্ম নারীরা। রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব না বাড়ালে এবং সকল স্তরে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া নারীর ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কল্পনা চাকমা সেটা উপলব্ধি করেছিলেন বলে রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনী কর্তৃক তাকে অপহরণ করা হয়েছে যার কোনো বিচার আজো হয়নি[৭৩]। আমরা এ পর্যায়ে দেশের সমতল অঞ্চলের কিছু উল্লেখযোগ্য আদিবাসী ভূমি বিরোধ ও ভূমি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ টানবো।

আলফ্রেড সরেনের ভূমি রক্ষার আন্দোলন

নওগাঁর মহাদেপুরের ভীমপুর গ্রামের এক প্রতিবাদী সাঁওতাল নেতা আলফ্রেড সরেন। আলফ্রেড সরেনের পিতা গায়না সরেন এবং মা ঠাকুররানী হাঁসদা। এলাকার স্থানীয় ভূমিগ্রাসী হাতেম আলী ও গদাই লস্কর এর দল ভীমপুর সাঁওতাল গ্রাম থেকে দরিদ্র সাঁওতালদের উচ্ছেদ করার নানান অত্যাচার চালায়। এর প্রতিবাদে সাঁওতালদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনে নামেন আলফ্রেড সরেন। ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট গদাই লস্কর ও হাতেম আলীদের সশস্ত্র দল আক্রমন করে ভীমপুর। বাঙালিদের উচ্ছেদ আক্রমন ঠেকাতে আলফ্রেড সরেন সাওঁতালদের নিয়ে রুখে দাঁড়ান। আক্রমনকারীদের আঘাতে ৩২ বছর বয়সে নিহত হন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের ভীমপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলফ্রেড সরেন। আলফ্রেড সরেন হত্যার ভেতর দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বাদে বিশেষত: উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র এলাকার আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের বিষয়টি দেশব্যাপী একটি গুরুত্বের জায়গাতে আলোচনায় আসে।

রক্তে রাঙা কুশদহ

২০০৮ সালে বাংলাদেশের দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার ৯ নং কুশদহ ইউনিয়নের খালিফপুর(ঝিমালী) গ্রামের সরকার টুডু (৫৯) এবং জাতভবানীপুর-পাটুপ্পাড়া গ্রামের সোম হাঁসদা(৫৬) এই দুইজন নিরীহ সাঁওতাল কৃষককে হত্যা করে স্থানীয় প্রভাবশালী বাঙালিরা খালের পানিতে লাশ ডুবিয়ে রেখেছিল। পানিতে ডোবা পচা লাশ ভেসে উঠার পর যখন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ বিষয়টি যখন বিষয়টি সবার নজরে আনেন তখনও এই অধিপতি রাষ্ট্রকে বলতে শোনা গেল, ...

---

[৬৮] ত্রিপুরা, প্রশান্ত। বাংলাদেশের আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৩ সালের আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা সংহতি ২০০৩ থেকে নেয়া হয়েছে। ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭-৩৮

[৬৯] Halim,Sadeka. Situation of Indigenous Women and ILO convention on Discrimination. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৭ সালের আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা সংহতি ২০০৭ থেকে নেয়া হয়েছে। ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৯-১২৪

[৭০] দারিং, ত্রিপলী। সমাজে মান্দি মহিলাদের অংশগ্রহণ। ওয়ানগালা ২০০৬ উদযাপন কমিটি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা ওয়ানগালা ২০০৬' শীর্ষক স্মরণিকা থেকে নেয়া হয়েছে। ঢাকা, পৃ. ২৯-৩০

[৭১] Halim,Sadeka. Insecurity of Indigenous women : a case study from Chittagong Hill tracts. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৩ সালের আন্তজার্তিক আদিবাসী দিবসের প্রকাশনা সংহতি ২০০৩ থেকে নেয়া হয়েছে। ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৯৫-১০৫

[৭২] Alamgir, Fariba. 2005, Towards the city : migration and continuti among the Mandis in Dhaka, M.S dissertation, Department of Anthropology, Dhaka

[৭৩] তালুকদার, টুকু। ২০০৫। আদিবাসী নারীর ভূমি অধিকার, কল্পনা চাকমার অপহরণের ৮ম প্রতিবাদ দিবস স্মরণে ইথিকা চাকমা সম্পাদিত স্মরণিকা 'কল্পনা স্মরণে', হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙামাটি, পৃ.৮-১৩

মদ হাড়িয়া খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে রাতের অন্ধকারে পানিতে ডুবে মরেছে...। অধিপতি কাঠামোর এই বক্তব্য আমাদের কাছে নতুন কোনো কিছু নয়, কারন প্রায় পাঁচশত বছর ধরে তা আমরা শুনে আসছি। হত্যার কারনও সেই একই, আদিবাসী সাঁওতালদের জন্মমাটি দখল করে সাঁওতালদেরকে ভূমিউদ্বাস্তু করা। জানা যায় দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার রহিমাপুর গ্রামের আবুল হোসেন, নজরুল মিয়া মেম্বার, কচুয়া গ্রামের মো. সেকেল মিয়া এবং মারসৈনিক গ্রামের একরামুল হক দীর্ঘদিন থেকেই স্থানীয় আদিবাসীদের কৃষিজমি এবং বসতভূমি জবরদখল করার জন্য বলপ্রয়োগ করে আসছে। সরকার টুডুদের ১৯ একর ৪ শতক নিজস্ব জমি জোরপূর্বক দখলের প্রক্রিয়া হিসেবেই সরকার টুডু এবং সোম হাঁসদাকে হত্যা করেছে ২০০৮ সনের জুন মাসে প্রভাবশালী বাঙালিরা। আর এই হত্যাকান্ডের ভেতর দিয়ে হড় মানে সাঁওতাল এবং দিকু মানে প্রভাবশালী শোষক (স্থানীয়ভাবে বাঙালিরাই দিকু হিসেবে বর্তমানে চিহ্নিত হয়েছেন) ভেতর ভূমিকেন্দ্রিক ভূমিবিরোধটি আবারো আমাদের সামনে প্রবলভাবে প্রকাশিত হল।

ভূমি অধিকার আন্দোলনের লড়াকু শহীদ গীদিতা রেমা

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার এককালের শালবন এলাকার এক আদিবাসী গ্রাম মাগন্তিনগর। এই গ্রামেই ১৯৭১ এর পরপরই এক মান্দি কৃষক পরিবারে জন্ম নেন গীদিতা রেমা। গীদিতার মায়ের নাম দীপালি রেমা, বাবা গনেশ রিছিল(পাগলা)। মধুপুর থেকে পঁচিশমাইল নেমে বা টেলকি থেকে ভেতরে মাগনতিনগর গীদিতাদের গ্রামে এখন বহিরাগত বাঙালিরই সংখ্যাই বেশী আর শালবনের কোনো বংশ নাই। এখন এই গ্রামে আনারস বাগানের এলাকাও কমে কলার বাগানে পরিণত হয়েছে। মাতৃসূত্রীয় মান্দি সমাজে নিজস্ব জুম-জমিন ভাগ বাটোয়ারার ক্ষেত্রে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, পরিবারে মেয়েদের, বিশেষত ছোট মেয়েদের প্রধান্য দেয়া হয়। সেই রীতিতে গীদিতাদের জমিনের অনেকটাই পায় গীদিতার ছোট বোন নম্রতা রেমা। আর এই জমির লোভেই এলাকার এককালের বহিরাগত বর্তমানের বাঙালি মফিজ গং নম্রতা রেমাকে অপহরন করে জোর করে বিয়ে করে ও ধর্মান্তরিত করে। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই নম্রতা মফিজের কবল থেকে পালিয়ে মাগন্তিনগর তাদের বাড়িতে চলে আসে। মফিজের ভয়ে নম্রতাকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয। মফিজ বাঙালি ব্যাটাগিরি ফলাতে ২০০১ এর ২০ মার্চ সশস্ত্র হামলা করে গীদিতাদের বাড়ি। নম্রতাকে না পেয়ে গীদিতার ছোট বোন ইতালিন রেমাকে জোর করে অপহরন করতে চাইলে, গীদিতা বাঁধা দেয়। ধারালো অস্ত্র নিয়ে মফিজ গং গীদিতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুন হয় গীদিতা। মফিজ গং পালায়। ২০ মার্চ ২০০১ তারিখে খুন হওয়ার পর মধুপুর এলাকার বাইরের মানুষ হিসেবে সঞ্জীব দ্রং সাংবাদিক সহ ২৫ মার্চ গীদিতাদের গ্রামে যান। গীদিতার বোন কবিতা রেমা বাদী হয়ে মধুপুর থানায় খুনীদের নাম উল্লেখ করে মামলা করে। তারপরও তো কতো খবর আর আর কতো প্রতিবাদ। কিন্তু কিছু হয়নি। আসামীরা কেউ কেউ গ্রেপ্তার হলেও টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়েছে, মধুপুর এলাকায এখনও তারা বুক টাটিয়ে ঘুড়ে বেড়ায়।

চৈলতাছড়া পুঞ্জির নাগরিক অধিকার

মাতৃসূত্রীয় খাসিয়াদের সবচে বড় পুঞ্জি(গ্রাম) ও পানজুম গুলোই মৌলভীবাজার জেলাতে অবস্থিত। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪ নং সিন্দুরখান ইউনিয়নের চৈলতাছড়া খাসিয়া পুঞ্জি(জে এল নং-১০৫, খতিয়ান নং-১, দাগ নং-৫৪, ৫৫) তার ভেতর একটি। মোট ২২০ একর ৮৬ শতক জায়গায় বসবাসকারী ৩৯ পরিবারের সবাই খাসিয়া। সরকারী খাস ডিসি খতিয়ানের অর্ন্তভূক্ত ২২০ একর ৮৬ শতক ভূমি ১৯৮২ সালে সিলেটের তৎকালীন জেলাপ্রশাসক মো. ফয়েজউল্লাহ খাসিয়াদের ৩৭টি পরিবারের জন্য একসনা বন্দোবস্তী করে দেন। খাসিয়ারা রাষ্ট্রীয় আইনী বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য সবসময়ই কোনো না কোনো বাঙালিদের আশ্রয় নিয়েছেন এবং কোনো প্রভাবশালী বাঙালি বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাহায্য নেন। এ যেন রাষ্ট্রে নিম্নবর্গের মানুষের ক্ষমতাকাঠামোয় অবস্থান না করার জন্য একধরনের শাস্তি একধরনের নিয়তি। ভূমি বিষয়ক নানান আইনগত ফায়সালার কাজে চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির মন্ত্রী(পুঞ্জিপ্রধান) সুই খাসিয়া নিয়োগ দেন শ্রীমঙ্গলের শ্রী সিতেশ রঞ্জন দেবকে(যিনি দেশে একজন বন্যপ্রাণী সংরক্ষক হিসেবে পরিচিত) এবং তাঁর কাজের পারিশ্রমিক বাবদ তাকে চৈলতাছড়া পুঞ্জির ৫০ একর ভূমি উপহার দেয়া হয়। ৬/৯/১৯৮৭ সালে সীতেশ রঞ্জন দেব এই ৫০ একর ভূমি ২,৫০,০০০ টাকার বিনিময়ে সিলেট জেলার গুয়াইনঘাট উপজেলার বড়লাই পুঞ্জির উইলিয়াম তংপেয়ারের কাছে বিক্রি করে দেন। উইলিয়াম তংপেয়ার ছিলেন এই পুঞ্জির জন্য একজন বহিরাগত মানুষ এবং তিনি চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির সকল ভূমি ভোগ দখল করার প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং চৈলতাছড়ার ৫০ একর ভূমি বাঙালিদের কাছে বিক্রির চেষ্টা করেন। অনোন্যপায় খাসিয়ারা শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৬নং সিন্দুরখান ইউনিয়নের প্রদীপ কংওয়াংকে এই জমি

কিনতে অনুরোধ করেন এবং পরবর্তীতে তিনি উইলিয়াম তংপেয়ারের কাছ থেকে ৫০ একর ভূমি ২,৬০,০০০ টাকা দিয়ে কিনে নেন। সুই খাসিয়া মন্ত্রীচ্যুত হন এবং ১৯৯০ সন থেকে চৈলতাছড়ার নতুন মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান জহিনুল কংওয়াং। ১৯৮৮ সালে মারহিলসন তংপেয়ার ভূমি থেকে উচ্ছেদের মিথ্যা কারণ দেখিয়ে সুই খাসিয়া, জহিনুল কংওয়াং এবং সরকারের নামে একটি দেওয়ানী মামলা করেন(মামলা নং ৬৪ নং ৮৮)। সুই খাসিয়া মারহিলসনের মামলাটিকে মিথ্যা বলে অভিযোগ করেন এবং এটি আইনত বাতিল হয়ে যায়। এখান থেকেই চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির ভূমি নিয়ে শুরু হয় মামলা মোকদ্দমা আর ‘আইনী’ হেনস্থা। ১০/১১/১৯৯০ সালে সুই খাসিয়া আবার জহিনুল কংওয়াং ও সরকারের বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানী মামলা করেন(মামলা নং-৬৯, ৯০ নং)। এই মামলায় আরো বাদী ছিলেন ওয়েল খাসিয়া। এই মামলার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের আইনগত কাঠামোতে খাসিয়াদের ‘অপর’ করে রাখার অধিপতিশীল বলপ্রয়োগগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। যে সুই তংপেয়ার এর নামে মারহিলসন খাসিয়া মামলা করেছিলেন তাকে অবৈধভাবে উচ্ছেদের জন্য, সেই সুই খাসিয়াই এই মামলার নথির চার নং বক্তব্যে এই জায়গা মারহিলসন তংপেয়ারের বলে স্বীকার করেন। এর প্রেক্ষিতে জহিনুল কংওয়াং পুরো বিষয়টিকে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সচিবালয়ে আবেদন করেন এবং তদন্তের পরপরই ১০০০ টাকা জরিমানা দিয়ে বিবাদীরা এই মামলা তুলে নেন। ১৯৯৫ সালের পয়লা মার্চ ওয়েল খাসিয়া চৈলতাছড়ার মন্ত্রী জহিনুল কংওয়াংয়ের নামে ভূমি অবৈধ দখলের মামলা করেন (মোকদ্দমা নং-১৫)। সচিবালয় থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখা যায় জহিনুল কংওয়াংসহ ৩৭ পরিবার চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির আইনত বৈধ দখলদার এবং এই মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১১/৪/১৯৯০ সালে চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির ৩৯টি খাসিয়া পরিবার ১৯৫.০০ একর এলাকার ভূমির বন্দোবস্থ পেয়েছেন(সূত্রঃ স্মারক নং ভূম/শা/৮/খাজব/৯৮/৮৯/৩০৯ তারিখ-১১/৪/৯০)। পাশাপাশি ১০/১/১৯৯০ এবং ১৭/১/১৯৯০ সালে সরেজমিন তদন্ত করে মৌলভীবাজার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ৭/২/১৯৯০ সালে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, চৈলতাছড়া মৌজায় ৫৪ নং ও ৫৫ নং দাগের ১০২.০০ একর এবং ৫৪৯.৫০ একর টিলা জমির মধ্যে মোট ২২০.৮৬ একর জমি জহিনুল খাসিয়াসহ অন্যান্য ৩৯টি খাসিয়া পরিবারের অনুকূলে একসনা বন্দোবস্ত প্রদান করা হয় ও ১৩৯৩ বাংলা সন পর্যন্ত নবায়ন পূর্বক খাজনা পরিশোধ করা হয়(সূত্রঃ স্মারক নং-ভূম/শা-৮/খাজব/১৩৬/৮৮/৬৫৮, তারিখ-২৬/১১/১৯৮৯)। ১৯৯৪ সালে সুই খাসিয়া মৌলভীবাজারের পুলিশসুপার বরাবর চৈলতাছড়া খাসিয়া পুঞ্জির ৩৯টি পরিবারকে বেআইনীভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনেন(সূত্রঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, স্মারক নং-অপরাধ/৪১২৪, তাং-২১/১২/৯৪। অথচ পুলিশ সুপারের প্রতিবেদনে বলা হয়, সুই খাসিয়া জয়লী খাসিয়ার কাছে তার চৈলতাছড়া পুঞ্জির জায়গা বিক্রি করে ডবলছড়া পুঞ্জিতে চলে যান। চৈলতাছড়া খাসিয়া পুঞ্জির ভূমি বিষয়ক জটিলতার জন্য এডভোকেট কমিশন একটি তদন্ত করেন এবং ১৯/৫/১৯৯৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার এডভোকেট কমিশনার আবদুল মুনীম চৌধুরী শ্রীমঙ্গলের সহকারী জজ আদালতে সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, চৈলতাছড়া খাসিয়া পুঞ্জির ৩৯টি খাসিয়া পরিবারের হেডম্যান জহিনুল খাসিয়া এবং তার নেতৃত্বে ৩৯টি খাসিয়া পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ঘটে সবচে সর্বনাশা ঘটনাটি। ঐদিন সুই খাসিয়া চৈলতাছড়া পুঞ্জির সমগ্র ভূমি বন্দোবস্তী দখলের জন্য বহিরাগত বাঙালি জনাব হোসেন মাহমুদ আবদুলাহকে স্বীকৃতি দিয়ে দেন। মৌলভীবাজারের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর জনাব মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক বরাবর চৈলতাছড়া পুঞ্জির ৩৯টি খাসিয়া পরিবারের মধ্যে ১৯৫ একর ভূমি স্থায়ী ভাবে বন্দোবস্তীর জন্য প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভূমি মন্ত্রণালয়ের টেলেকাবার্তা নং-২৬৬/১ তারিখ ২/৫/৯৫ এ পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়েছে চৈলতাছড়া খাসিয়াপুঞ্জির জায়গা খাসিয়াদের। কিন্তু এতসবের পরও চৈলতাছড়া খাসিয়া পুঞ্জির বাসিন্দরা জানেন না নিজেদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত থাকবে কিনা। চৈলতাছড়া পান পুঞ্জির ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পুঞ্জির মন্ত্রী জহিনুল কংওয়াং ২০০২ সনে আবারো পুনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করেন(সূত্রঃ নথি নং-শা-৮/খাজব/১৩৬/৮৮(অংশ))। আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশের একটিমাত্র খাসিয়াপুঞ্জির ভূমি বিষয়ক জটিলতার কথা জানলাম, এটি সকল পুঞ্জিতেই আছে, এবং অন্যান্য পুঞ্জিতে এর সাথে জড়িত হয়েছে আন্তজার্তিক পর্যটন বাণিজ্য ও নানান বহুজাতিক কর্পোরেট স্বার্থ। মাতৃসূত্রীয় খাসিয়া সমাজে পরিবারের নারীরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়ে থাকেন, যদিও আজকাল পণ্য বিশ্বায়নের এই বাঙালি রাষ্ট্রে এটি বদলে গিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নে পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে খাসিয়ারাই একমাত্র জনগোষ্ঠী যারা ধান আবাদ করেন না, মূলতঃ পান ও অন্যান্য ফসলাদি জুমের মাধ্যমেই জীবন নির্বাহ হয় খাসিয়াদের। আর এর জন্য প্রয়োজন পাহাড়ি বন টিলা ভূমি। বনবিভাগ, ইকোপার্ক প্রকল্প, গ্যাসকোম্পানির খনন, চাবাগান, বহিরাগত বাঙালিদের অত্যাচার যেমন খাসিয়া ভূমি সমস্যার সাথে জড়িত পাশাপাশি খাসিয়াদের ভেতর আন্ত:বিরোধ গুলোও সম্পর্কিত। সুই খাসিয়ার মৃত্যুর পর ২০০৭ এর এপ্রিল মাসে তারই সন্তান বার্লেট খাসিয়া ৫পরিবার খাসিয়া প্রতিনিধিসহ শ্রীমঙ্গল প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে দাবী করেন চৈলতাছড়া পুঞ্জির বর্তমান মন্ত্রী জহিনুল কংওয়াং সিলেটের নকসিয়ার পুঞ্জি থেকে এসে চৈলতাছড়ার ৩৯ পরিবারকে

বিতাড়িত করে অবৈধ ভোগদখল করছেন এবং খাসিয়াদের উচ্ছেদ করেছেন(সূত্রঃ সাপ্তাহিক চায়ের দেশ, ৮এপ্রিল ২০০৭, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)। যে চৈলতাছড়া পুঞ্জির কথা আমরা তুলেছি তার ৩৯টি পরিবারের মানুষেরা এখনও আছেন, তাদের এখনও আশংকা ও উচ্ছেদের ভয়। কারণ খাসিয়ারা চোখের সামনে বৈরাগী পুঞ্জি, শীতলা পুঞ্জি, জোলেখা পুঞ্জি, নার্সারী পুঞ্জি, ফুলতলা পুঞ্জি দখল হয়ে যেতে দেখেছেন। বহিরাগত বাঙালি ও বনবিভাগের দখল থেকে ফুলতলা পুঞ্জিতে রক্ষা করতে শহীদ হয়েছেন চাবাগান শ্রমিক অবিনাশ মুড়া। ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৭(১) ধারায় যে ২২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে খাসিয়াদের নাম নেই। রাষ্ট্রের ভূমিনীতি বা ভূমি সংক্রান্ত আইন কোনোটাই খাসিয়াদের আপন বসতে খাসিয়াদের নিরূপদ্রব বসবাসের নিশ্চয়তা দেয় না।

আদিবাসী ভূমি অধিকার : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি প্রসঙ্গ

কৃতজ্ঞ যে আমি ঐ নিয়তির কাছে,
তুমি ইচ্ছে করেছিলে তাই এই আসার,
অর্থাৎ শিকড়ে ফেরা-
শ্রুতকীর্তি পূর্বপুরুষেরা
বংশগতি-পরম্পরা হারিয়ে ফেলে যে
আলস্যে ঘুমিয়ে ছিলো।
অবশেষে অপদার্থ অধঃস্তনই আজ
বিচ্ছিন্ন সূত্রটি জোড়া লাগাবার কাজে
এখানে এসেছে...
আ'চিক দেবতাশ্রেষ্ঠ
তাতারারাবুগা ইচ্ছে করেছিলো, তাই
রফিক মারাক পূর্বপুরুষের দেশে
আসিয়াছে ফিরে[৭৪]।।
(শেকড়ে ফেরা, রফিক আজাদ)

জাতীয় ভূমি, পরিবেশ, পানি, প্রাণবৈচিত্র্য বিষয়ক বেশ কিছু জাতীয় আইন ও খসড়া আইনে আদিবাসী অধিকারের প্রসঙ্গসমূহ ইতিবাচক ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান আইন সমূহের তেমন কোনো প্রয়োগ স্থানীয় এলাকায় দেখা যায় না। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং আইনী কর্তৃপক্ষের অবজ্ঞা-অবহেলা এবং সকল আইন সম্পর্কে উপযোগী ও সর্বোপরি ধারণা না থাকাকেই অধিকাংশরা দায়ী করেন। ১৭৯৩ সনে The Bengal permanent settlement regulation 1793 নামে ভূমি বিষয়ক আইন তৈরী হয়। পরবর্তীতে ১৭৯৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ভূমি বিষয়ক প্রায় ১৭৯টি আইন ও নীতিমালা তৈরী হয়েছে[৭৫]। ভূমিকে কেন্দ্র করে একটি গরীব দেশে ১৭৯টি আইন থাকা দেশের ভূমি সমস্যার প্রকটতাকেই হাজির করে। আজকের আলাপে আমরা প্রথমে আদিবাসী ভূমি সম্পর্কিত বেশ কিছু জাতীয় আইনের প্রসঙ্গ টানবো এবং পরবর্তীতে কিছু আর্ন্তজাতিক সনদ ও আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবো। সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর দিনাজপুর এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের শ্রীবদী, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা নিয়ে ১৯৩৫ সনে ভারত শাসন আইনে 'Partially excluded area' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে উক্ত এলাকাকে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ন্যায় 'উপজাতীয় অঞ্চল' হিসেবে অর্ন্তভূক্ত

---

[৭৪] কবিতাটি ওয়ানগালা ২০০৬ উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ স্মরণিকা 'ওয়ানগালা ২০০৬' থেকে নেয়া হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেছেন বাবুল ডি নকরেক, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৪৭

[৭৫] ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ..৫০৯-৫১৬

করেনি[৭৬]। কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম 'বিশেষ উপজাতীয় এলাকা' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাংসদ হিসেবে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত চারদফা দাবীসমূহ তুলে ধরেছিলেন[৭৭] :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।
২. উপজাতীয় জনগণের আধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।
৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করতে হবে।
৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ছাড়া এ অঞ্চলের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বা পরিবর্তন যেন না হয় এইরূপ সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর ৬৪ ধারায় ভূমি হস্তান্তরে বাধা-নিষেধ বিষয়ে বলা হয়েছে, আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, বরং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত ও রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।'

আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে জেলা প্রশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের আদেশ দ্বারা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইনের ৮৮ ধারা সংশোধনক্রমে উক্ত আইনের ২০ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী চা বাগানের দখলে রাখা খাস জমি জেলার ডেপুটি কমিশনারের পূর্বানুমতি ভিন্ন হস্তান্তর করা যাবে না[৭৮]। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধিমালার ৪১ নং অনুচ্ছেদে 'জুমচাষ নিয়ন্ত্রণ বিধিতে' বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় জুমচাষ নিয়ন্ত্রণ ও প্রণালীবদ্ধ করার জন্য তার বিবেচনায় প্রয়োজন মর্মে অনুমতি আদেশ জারী ও উহা কার্যকর করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। পর্যাপ্ত কারণ থাকলে তিনি কোন এলাকায় জুমচাষ বন্ধ রাখার অথবা জুম চাষের জন্য অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করার ঘোষণা দিতে পারবেন। কিন্তু বরাবরই দেখা যায় আদিবাসীদের ভূমি জোরপূর্বক দখল করা হয়, আদিবাসীদের বাস্তুভিটা থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হয়। আদিবাসী ভূমির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসনকে আরো কার্যকরী ও আদিবাসী আইন বান্ধব হওয়া জরুরী। আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় আইন হচ্ছে 'রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব (সংশোধিত) আইন ২০০৪। আমরা এখন এই আইনের আওতায় আদিবাসী ভূমি বিষয়ক প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা করবো :

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব (সংশোধিত) আইন ২০০৪ (The State aquisition and Tenancy (Amendment) act 2004)

The East Bengal state aquisition and tenancy act 1950 নামে একটি বিল ১৯৪৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি জনমত যাচাইয়ের জন্য গেজেটে প্রকাশ করা হয়। ৭ এপ্রিল ১৯৪৮ সংসদের বিশেষ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৯ সালে বিজ্ঞপ্তি নং-১২৬২ এল এ মূলে তাদের সংশোধনী প্রস্তাব জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে পূর্ব-বঙ্গীয় পার্লামেন্টে কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর ১৯৫০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয়

---

[৭৬] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১৫

[৭৭] ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা। রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ। ২০০২। পৃ.৩৫-৩৬

[৭৮] সিংহ, রামকান্ত। ২০০৩, বাংলাদেশের উপজাতিদের আইন, এ এইচ ডেভলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৪০-১৪১

অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ বিলটি পাশ হয় এবং ১৬ মে ১৯৫১ তারিখে গভর্ণর জেনারেল বিলে সম্মতি প্রদান করেন। ১৯৬০ সালে ২৮ নং অধ্যাদেশ দ্বারা এ নাম সংশোধন করে The East Pakistan state aquisition and tenancy act 1950 নাম করা হয়। ১৯৭২ সালে ৪৮ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে এর নাম করা হয় The Bangladesh State aquisition and Tenancy act 1950। পরবর্তীতে ২০০৪ সনে ২০০৪ সনের ৯নং আইনের মাধ্যমে উক্ত আইন সংশোধন করে নাম রাখা হয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধিত) আইন ২০০৪ (The State aquisition and Tenancy (Amendment) act 2004)। উক্ত আইনের ৯৭ ধারায় আদিবাসীদের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। 'Aboriginal' হিসেবে উক্ত আইনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, বনিয়াস, ভুঁইয়া, ডালু, হাদী, ভূমিজ, গারো, হাজং, খাসিয়া, কোচ, মগ, খোড়া, ওঁরাও, দালুজ, মেচ, মুন্ডা, তোড়ি, খারওয়ার, মাল, সুরিয়া, পাহাইয়াস, মন্ডিয়া, গন্ডা, তুরিস আদিবাসীদের নাম। যারা এই আইনের আইনগত অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখেন[৭৯]।

রাষ্ট্রীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর অনুচ্ছেদ-৯৭-এ বলা হয়েছে :
The Government may from time to time, by notification, declares that the provisions of section shall, in any District or local area apply to such of the followling of the aboriginal cast or tribes shall be deemed to be aboriginals, for the purpose of this section, and the publication toss shall be conclusive evidence that the provisions of this section have been duly applied to such castes or tribes.

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ (ইস্ট বেঙ্গল এ্যাক্ট নং ২৮/১৯৫১) এর নিয়মানুয়ায়ী আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তরে বেশ কিছু উপধারা রয়েছে[৮০] :

উপধারা : ২ : কোন উপজাতি বা আদিবাসী তার ভূমি অনুরূপ আদিবাসী ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করলে তা বৈধ হবে না।
উপধারা : ৩ : আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর ক্রয়-বিক্রয়, দান এবং উইল প্রক্রিয়ায় হতে পারে। তবে বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর আদিবাসীদের ভেতরেই হতে হবে। কোন আদিবাসী তার ভূমি অন্য কোনো আদিবীকে বিক্রয়, দান এবং উইল হস্তান্তর করতে পারে। অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আদিবাসী তার ভূমি বিক্রয় করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে রেভিনিউ অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে এই ধরনের হস্তান্তর হতে পারে।
উপধারা : ৪ : প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে হতে হবে এবং দলিল রেজিষ্ট্রি হওয়ার পূর্বে এবং হোল্ডিং অথবা এর যে কোন খন্ডে হস্তান্তরিত হলে দলিল মতে এবং হস্তান্তরের শর্ত অনুযায়ী রাজস্ব অফিসারের লিখিত সম্মতি নিতে হবে।
উপধারা : ৫ : একজন আদিবাসী অন্য কোন বাংলাদেশি বা বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য আদিবাসীর নিকট স্বীয় জমি খাইখালাসী বন্ধক দিতে পারবে। এরূপ বন্ধকের মেয়াদ ৭ বছরের অধিক হবে না বরং বন্ধকটি অবশ্যই ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী হতে হবে।
উপধারা : ৭: আদিবাসী হস্তান্তর এই ধারার বিধান লংঘন করা হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।
উপধারা : ৮ : যদি কোন আদিবাসী রায়ত এই ধারার বিধানসমূহ লংঘন করে কোনো হোল্ডিং বা এর অংশ হস্তান্তর করা হলে রাজস্ব অফিসার রাজস্ব রেভিনিউ অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো আদিবাসীর ভূমি অন্য কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যাক্তির নিকট হস্তান্তর হলে সেই হস্তান্তর বলবৎ হবে না।

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪

---

[৭৯] ভুঞ্রা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : পাকিস্থান ও বাংলাদেশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫৪

[৮০] রায়, অভিজিৎ; আলী, মো. এরশাদ ও সেন, সুকান্ত। ২০০৯, বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ১১৬-১১৭ এবং সিংহ, রামকান্ত। ২০০৩, বাংলাদেশের উপজাতিদের আইন, এ এইচ ডেভলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পৃ. ৩১৯-৩২০ এবং সিদ্দিক, এ কে এম। ২০০২, সাধারন ভূমি আইন ও বিধি, এ কে এম সিদ্দিক, ঢাকা, পৃ. ৫৬-৫৮ এই তিনটি বই থেকে এ অংশটুকু নেয়া হয়েছে।

ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী[৮১] জোরপূর্বক আদিবাসীদের গ্রাম ও নিজস্ব বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা বেআইনী। পল্লী এলাকায় বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত কোন ভূমি হতে বাড়ি মালিককে উচ্ছেদ করা যাবে না (সূত্রঃ ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪, ধারা:৩)

প্রাণবৈচিত্র্য ও গোষ্ঠীগত জ্ঞান সুরক্ষা আইন (১৯৯৮,খসড়া)

ট্রিপস চুক্তির বিবেচনায় জনগণের প্রাণসম্পদের রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, লোকায়ত জ্ঞান ও সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার উপর জনগণের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে *Plant Varieties Act of Bangladesh* এবং সিবিডির আলোকে *Biodiversity and community knowledge protection act* নামে দুটি আইনগত খসড়া দলিল তৈরী করে। উক্ত খসড়া আইন অনুযায়ী ১৪ সদস্যের যে 'ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি অথরিটি কমিটি' সেখানে দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ৬ জন প্রতিনিধি থাকার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। এটিই দেশের একমাত্র উদ্যোগ যেখানে আদিবাসীদের প্রথাগত জ্ঞান ও সম্পদের অধিকারকে বিবেচনা করা হয়েছে কিছুটা হলেও।

জাতীয় ভূমি ব্যহার নীতিমালা ২০০১

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ এ স্পষ্ট আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বিষয়টি 'উপজাতীয় সম্প্রদায়' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে প্রচলিত আইন মোতাবেক ভূমির অধিকার প্রদানসহ তাদের সমাজগত অধিকার সংরক্ষণ করা হবে (সূত্র : জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, ধারা ১৬.২৮)। এমনকি এই নীতিমালা অনুযায়ী আদিবাসীদের ভূমির প্রথাগত অধিকারের প্রতিও সমর্থন রেখেছে রাষ্ট্র, নীতিমালাতে আদিবাসীদের 'সমাজগত অধিকার' সংরক্ষণের উল্লেখ রাখা হয়েছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে একটি বিশোর্ধ আন্ত:মন্ত্রণালয় ভিত্তিক জাতীয় কমিটি গঠন এবং জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটিকে সাচিবিক সহযোগিতা করার জন্য ভূমিমন্ত্রীকে আহবায়ক করে আরেকটি আন্ত:মন্ত্রণালয় ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার বাস্ত বায়ন কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (সূত্র : জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ : অনুচ্ছে ১৮ ও ১৯)। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্বপাকিস্থানের মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সুসং দূর্গাপুর এলাকায় এসে টংকপ্রথা উচ্ছেদ ও কৃষকদের জমির স্বত্ত্ব দেবার আশ্বাসসহ এলাকায় রাস্তাঘাট ও স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলে আন্দোলনকারীদের নিবৃত্ত করার পথ খোঁজে নেয়[৮২]।

আদিবাসী ভূমি অধিকার সম্পর্কিত আন্তজাতিক আইন ও সনদ

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (আইএলও কনভেনশন নং-১০৭)

Indigenous and Tribal populations convention, 1957 (ILO 107)[83]

অনুচ্ছেদ:১১, দ্বিতীয় অংশ : ভূমি : সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যাক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে । বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছে।

Indigenous and Tribal peoples convention, 1989 (ILO 169)

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন ১৯৮৯ (আইএলও-সি ১৬৯)[৮৪]

---

[৮১] ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান। ২০০৩, যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা : পাকিস্থান ও বাংলাদেশ আমল, কানিজ ফাতিমা ও মো. হাফিজুর রহমান ভূঞা যৌথভাবে বইটি প্রকাশ করেছেন, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৩৮

[৮২] আইয়োব, আলী আহাম্মদ খান। ২০০৫, বাংলাদেশের হাজং সম্প্রদায়, সূচীপত্র, ঢাকা, পৃ. ৪৫

[৮৩] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১০-১১

[৮৪] সেন, সুকান্ত; রায়, অভিজিৎ ও লামিন, সিলভানুস। ২০০৭, সমতলের আদিবাসী : অধিকার ও অধিকারহীনতা, বারসিক, ঢাকা, পৃ. ৯২-৯৩ এবং পূর্বোক্ত বাংলাদেশের ডালু বইয়ের পৃ.১১৭-১১৮ অংশ থেকে এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪.১ : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে আয়ত্তকৃত জমির মালিকানার অধিকার ও ঐতিহ্যগতভাবে দখলীস্বত্ত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহারকৃত জমি যা তাদের জীবনযাপন এবং ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রমে ব্যবহার করতো সেগুলো রক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই মর্মে যাযাবর ও স্থান পরিবর্তনকারী চাষীদের অবস্থাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৪.২ : সরকার এসব জনগোষ্ঠীর ঐহিত্যগতভাবে আয়ত্তকৃত ভূমি চিহ্নিতকরণ এবং তাদের মালিকানার অধিকার ও দখলীস্বত্ত্বে কার্যকরী নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধান করবে (অনুচ্ছেদ ১৪.২)

আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (Converntion on biological diversity 1992/CBD 1992)

বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (Converntion on biological diversity 1992/CBD 1992) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৯২ সালের ৫ জুন এ সনদটি স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালের ৩ মে অনুসমর্থন দান করে। উক্ত সনদের আলোকে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে "Biodivercity and community knowledge protection act নামে একটি আইনের খসড়া তৈরি করেছে। উক্ত আন্তর্জাতিক সনদ প্রাণবৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, প্রাণসম্পদের অধিকার ও আদিবাসীসহ গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব জ্ঞান-সম্পদ-অভিজ্ঞতার সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু আইনগত সিদ্ধান্ত হাজির করেছে।

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র

অনুচ্ছেদ : ২৮ : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ যা তাদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় দখলকৃত বা ব্যবহারকৃত, এবং যা তাদের স্বাধীন ও পূর্ব সম্মতি ছাড়া বেদখল, ছিনতাই, দখল বা ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে এসব যাতে ফিরে পায় কিংবা তা সম্ভব না হলে, একটা ন্যায্য, যথাযথ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় তার প্রতিকার পাওয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে।[৮৫]

সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের কার্যকর ভূমি কমিশন ও নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহার

আকমু চিকারি দিয়া কথা এতা মাতিস ইত্তাউ
নিবে যারগা হাকহানদে তোর কথাতারাগি শাতক
কথা দিয়া না-থছিলা মানু লাজে আহিগি জিপাগা
আধারর তলে আজি খংচেলর বেদিশা মিঙালে
বাজিস হে খঞ্জনিগ হৃৎনর্তর তালে তালে।
(একবার চিৎকার করে বলো বন্ধু কথাগুলো
নিভে যাওয়া আকাশে তোমার কথানক্ষত্র ফুটুক
কথা দিয়ে না রাখা মানুষ চোখ ঝিমাক লজ্জায়
আঁধারের তলে আজ দিশাহারা কণ্ঠমণিজালে
বেজে ওঠো হে খঞ্জনি হৃৎনর্তনের তালে তালে[৮৬] ।)

পূর্ববাংলায় নূরুল আমিনের মন্ত্রীসভায় (১৯৪৮-১৯৫৪) পাকিস্থানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সমষ্টিগত আদর্শ প্রস্তাবের ভেতর উল্লেখ ছিল, পাকিস্থানে সংখ্যালঘু এবং অনুন্নত-অনগ্রসর শ্রেণী সমূহের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হবে। এ সময়টাতেই ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১৯৫০ পাশ হয়[৮৭]। সেইসময় আদিবাসীদের ভূমি হস্তান্তর ও ভূমি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য সেই আইন কিছুটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও আজ তার প্রায় ষাট বছর পর সকল পরিবর্তনশীলতাকে বিচার বিবেচনা করেই আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা

---

[৮৫] দ্রং, সঞ্জীব। ২০০৮। আদিবাসী মানবাধিকার ২০০৮, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, পৃ.১০-১১

[৮৬] কবিতাটি শভাশিস সিনহার 'নয়া করে চিনুরি মেয়েক' মানে অক্ষর নতুন করে চিনি বই থেকে নেয়া হয়েছে। বইটিতে কবি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই কবিতাগুলো লিখেছেন। ভাষাচিত্র, ঢাকা থেকে ২০০৯ সনে এটি প্রকাশিত হয়েছে। পৃ. ১১

[৮৭] রশিদ, হারুন-অর। ২০০৯, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০৮), হাসিনা প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭৩-১৭৪

সমাধানের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের দাবি যৌক্তিকভাবে উঠেছে। বাংলাদেশ ভূমির আমূল সংস্কার প্রসঙ্গে গণি (১৯৯৭) বলেছেন, সামন্তবাদী গোষ্ঠী, জোতদার, দালাল, মধ্যস্বত্ত্বভোগী বা মুৎসুদ্দীর কৃত্রিম গণস্বার্থ বিরোধী নেতৃত্ব ভেঙ্গে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় শক্তিকাঠামোর পরিবর্তন আনার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে[৮৮]। সমতলের আদিবাসীদের এই ভূমি কমিশনের দাবি দেশের আমূল ভূমি সংস্কারেরই এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও উদ্যোগ হিসেবে উদাহরণ তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি এই কমিশন কিভাবে কাজ করবে কি ধরনের কাজ করবে এ নিয়ে আদিবাসীসহ অন্যান্যরাও বেশ চিন্তাভাবনা করছেন। সামান্য হলেও কিছু কিছু আলোচনা এগিয়েছে। যেমন সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সিং (২০০৪) প্রস্তাব করেছেন, ভূমিহীন আদিবাসীদের মধ্যে খাসজমি প্রদান করতে হবে এবং ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল ১৯৮৭ এর ৬০ নং পৃষ্ঠার ৭২ ধারা অনুযায়ী খাসজমিতে বসবাসকারী ভূমিহীনদের ওই জমিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে এবং কখনো তাদের উচ্ছেদ করা যাবে না[৮৯]। এরকম অংসখ্য প্রায়োগিক বিবেচনা এবং পথপদ্ধতি দিয়েই হয়তো ভূমি কমিশনের কাঠামো তৈরি হবে। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা ও বিরাজিত করুণ-বেআআইনী ভূমিবিরোধ-সংঘর্ষসমূহ কমিয়ে নিয়ে আসা এবং নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এক সমন্বিত রাষ্ট্রীয় আইনকাঠামো হিসেবে 'পৃথক-স্বতন্ত্র-কার্যকর-আদিবাসীবান্ধব ভূমি কমিশনের' দাবি আন্দোলনরত আদিবাসী সংগঠন-গবেষক-বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন-আইনজীবী-রাজনীতিক-গণমাধ্যম এবং মানবাধিকারকর্মীদের। আদিবাসীদের দূরে রেখে কোনো জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়, আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা প্রয়োজন বলে আজকাল অনেক রাজনীতিকই জোরালো মতপ্রকাশ করেন[৯০]।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মূল সমস্যা হল ভূমি সমস্যা। এ সমস্যা উদ্ভবের পশ্চাতে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত সরকারী নীতিই ছিল প্রধানত: দায়ী। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত মোট ২৬ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোট চারখন্ডে বিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডে ৪,৫ ও ৬নং অনুচ্ছেদে ল্যান্ডকমিশন গঠন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ বিষয়াবলী অর্ন্তভূক্ত রয়েছে[৯১]।

সতমল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের দাবিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ২৮-২৯ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আটটি জেলায় সংগঠিত করে হাজার হাজার আদিবাসী নারী পুরুষের এক দীর্ঘ গণপদযাত্রা। দেশের সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ যে নয় দফা দাবি পেশ করছে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তার ভেতর ভূমি বিষয়ক দাবি সমূহ হল[৯২] :

১. সরকারি খাস, জমিদারী খাস ও দীর্ঘদিন যাবত বসবাসরত ভিটা দখলী শর্তে আদিবাসীদের আইনগত মালিকানা দিতে হবে।
২. অবৈধ জাল ও বেদখল জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি খরচে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. গৃহহীন আদিবাসীদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[৮৮] গণি, এবিএম ওসমান। ১৯৯৭, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভূমি সংস্কার কর্মসূচি কেমন হবে (প্রেক্ষিত বিশ্লেষন ও সুপারিশ), সোসাল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

[৮৯] সিং, বিশ্বনাথ। ২০০৪, আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা, বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমতা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল রাইটস থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে, সংখ্যাঃ ৮, সমতা, ঢাকা

[৯০] অধিকার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক আস্থা প্রকাশিত মাসিক বুলেটিন 'আস্থার' আগস্ট ২০০৮ সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে। এটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন দেবাশিষ প্রমাণিক দেবু, রাজশাহী, প্রথম পাতা। ৯ আগস্ট ২০০৮ তারিখে রাজশীহী জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ আয়োজিত সভায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশার বক্তব্য।

[৯১] চাকমা, শ্রী গৌতম কুমার। ২০০২। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে ভূমি ব্যবস্থাপনা। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ২০০২ উপলক্ষ্যে মথুরা ত্রিপুরা সম্পাদিত ও জাবারাং কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'ভূমি, সংস্কৃতি ও আদিবাসী' বিষয়ক বিশেষ প্রকাশনা। খাগড়াছড়ি, বাংলাদেশ, পৃ. ২৪-৩২

[৯২] সরেন, রবীন্দ্রনাথ। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী : ভূমি সমস্যা জীবনের সংকট। সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫১তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫১ তম বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হুল নামের স্মরণিকা থেকে লেখাটি নেয়া হয়েছে। এটি সম্পাদনা করেছেন পাভেল পার্থ, হিরণমিত্র চাকমা, সিলভানুস লামিন এবং জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, বাংলাদেশের ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছে ৩০ জুন ২০০৬, পৃ. ২৩-২৫

৪. অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে যে সকল সম্পত্তি আদিবাসীদের হাত ছাড়া হয়েছে তা যথাযথ উত্তরাধিকারের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।
৫. সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় ও আদিবাসীদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমতা কর্তৃক তৈরি ধারণাপত্রে সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠনের প্রয়োজনীতা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়[৯৩]। ২০০৩ সালের ১৯ মে মধুপরের আদিবাসীদের সাথে পরিবেশ ও বনমন্ত্রীর এর বৈঠকে আদিবাসীরা দশটি দাবি উত্থাপন করেন। মধুপুরের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য তারা পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর কাছে ভূমি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন[৯৪]। কামাল ও অন্যান্যরা (২০০৩) সাঁওতাল সমাজের ভূমি সমস্যা সমাধানে যে সাতটি প্রস্তাব হাজির করেছেন তার ভেতর ভূমি বিষয়ক ভূমি ট্রাইব্যুনাল গঠন অন্যতম[৯৫]। আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য কামাল ও বানু (২০০৩) পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন[৯৬]। বনবিভাগ কর্তৃক ইকোপার্ক প্রকল্প (মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প) বাস্তবায়ন ও মধুপুরের আদিবাসীদের সাথে বনবিভাগ ও বাঙালিদের ভূমিবিরোধ নিরসনে মধুপুরের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে ১২টি পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। যার একটি হল ভূমি কমিশন[৯৭]। আচার্য ও অন্যান্যরা (২০০৭) জানান, আদিবাসীদের ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে পড়া প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারন সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, সমতলের আদিবাসীদের ওপর চলছে নানা ধরণের নির্যাতন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতৃবৃন্দও একই মত পোষণ করেন। তারা প্রতিনিয়ত জমি হারাচ্ছে। সমতলের আদিবাসীদের জমি রক্ষার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এদিকে সমতাসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠনের দাবি তুলেছে। আদিবাসী ফোরামও এ দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে ভূমি প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুর সাত্তার ভুঁইয়া সমতলের আদিবাসীদের জমি সমস্যা নিয়ে মন্ত্রণালয় অবগত আছেন বলে জানিয়েছেন। তবে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে তিনি জানান। বিশেষজ্ঞদের মতে সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠন করা যেতে পারে[৯৮]। ভূমি বিষয়ক বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন এএলআরডি (২০০৬) প্রস্তাব করেছে, আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে স্বীকার করে আদিবাসীদের সমন্বয়ে ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে[৯৯]। হক ও অন্যান্যরাও (২০০৯) আদিবাসীদের ভূমি জরিপের জন্যে একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছেন[১০০]। ২৫ জুন ২০০৯ তারিখে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটির ভিআইপি মিলনায়তনে অধিকারভিত্তিক পাঁচটি সংগঠন এএলআরডি-ব্লাস্ট-আইন ও সালিশ কেন্দ্র-নিজেরা করি-টিআইবি নওঁগা জেলার পোরশাতে ১২ জুন ২০০৯ তারিখে সংগঠিত বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী ভূমি দখল ও গ্রাম হামলা

---

[৯৩] ধারণাপত্র, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমতার ন্যাচারাল পলিসি এডভোকেসি সেল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

[94] Mankin, Albert. 2004, The rights of Adivasis on land and forests : Bangladesh Government perspectives, CIPRAD, Dhaka

[৯৫] Kamal, Mesbah; Samad, Dr. Muhammad & Banu, Nilufar. 2003, The Santal community in Bangladesh : problems and prospects, RDC, Dhaka, p. 16-20

[৯৬] Kamal, M. and Samad, Dr. M Banu. 2003, Santal community in Bangladesh : problems and prospects, RDC, Dhaka

[৯৭] Satter, Fazlous. 2006, Struggle for survival : a study on the legal status of the Mandi peoples' land rights in Modhupur forest area, Shrabon Prokashani, Dhaka, p.172-173

[৯৮] আচার্য, জয়ন্ত; বর্মণ, পিযূষ; চক্রবর্তী, বিভাষ এবং সিকদার, সৌরভ। ২০০৭, আদিবাসীদের ভূমি হারানোর কারণ এবং সামাজিক জীবনে এর প্রভাব : প্রেক্ষিত গাজীপুর জেলা, অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ঢাকা, পৃ. ২১

[৯৯] বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন এ এল আরডি কর্তৃক প্রকাশিত ভূমিবার্তা, সংখ্যা ৩১ আগস্ট ২০০৬

[১০০] হোসেন, আইয়ুব; হক, চারু ও রিন্তি, রিজুয়ানা। ২০০৯, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, হাক্কানী পালিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৩৯

বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে যে সাত দফা দাবি উত্থাপন করে। এর ভেতর তারা সমতল ভূমির আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়[১০১]। 'বিশ্ব শ্রম সংস্থা-বাংলাদেশ এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন আরডিসি আয়োজিত 'আইএলও কনভেনশন ১৬৯ : বাংলাদেশের আদিবাসী ও জাতীয় সংসদ' শীর্ষক বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দীপংকর তালুকদার জানান, আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকার দ্রুত একটি পৃথক ল্যান্ড কমিশন গঠন করবে[১০২]। নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আদিবাসীদের জন্য পৃথক ল্যান্ড বা ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ওয়াদা করেছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ : রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী প্রসঙ্গ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর আগে দেশের নির্বাচনের পক্ষের রাজনৈতিক দল সমূহ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসী বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল। আমরা আজকের আলাপের শেষ পর্যায়ে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহার সমূহ পাঠ করবো এবং রাজনৈতিক দল সমূহকে নিজেদের রাজনৈতিক ওয়াদা ও শর্তগুলো পূরণে আহবান জানাবো।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮[১০৩]

২০০৫ সালের ১৫ জুলাই ঘোষিত ১৪ দলের ৩১-দফা সংস্কার কর্মসূচি এবং ২২ নভেম্বর গৃহীত ২৩-দফা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির আলোকে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ভিশন ২০২১ দিনবদলের সনদ। নির্বাচনী ইশতেহারের ১৮ নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে আদিবাসী অধিকার বিষয়াবলী।

১৮.১ : ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লংঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।
আদিবাসীদের জমি, জলাদার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৮.২ : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহরে উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
বস্তি, চর, হাওড়, বাওড় ও উপকূলসহ সকল অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নির্বাচনী ইশহেতার ২০০৮[১০৪]

১৩ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে ঢাকায় শহীদ আসাদ মিলনায়তনে ঘোষিত বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে ২১টি বিষয়ভিত্তিক অনুচ্ছেদের ভেতর ১৫ নং অনুচ্ছেদটি 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও আদিবাসী অধিকার' বিষয়ক। এখানে ঘোষণা করা হয়েছিল :

---

[১০১] প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১২ জুন ২০০৯

[১০২] সূত্র : http://communicatinglabourrights.wordpress.com/2009/12/20/bangladesh-land-commission-for-indigenous-people-soon/)

[১০৩] দিনবদলের সনদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এটি প্রকাশিত হয়েছে, ২০০৮, ঢাকা।

[১০৪] ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ.১৩

ক. পাহাড়ে, সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। এই জাতিসমূহরে ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন প্রতাকে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. আদিবাসীদের জমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সমতলে সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওঁরাওসহ সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা।

গ. ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির অসঙ্গতিসমূহ দূর করা এবং চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ. ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বা আদিবাসী সমাজ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে ভূমি ও জীববৈচিত্র্য বিনাশকারী সকল ধরনের তৎপরতা বন্ধ করা। আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব, পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবিকাকে বিপন্ন করে এমন ধরনের ততাকথিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা।

ঙ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। সকল জাতিসত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ. আলফ্রেড সরেন, পীরেন স্নাল, সত্যবান হাজং, চরেশ রিছেল হত্যাকান্ডসহ আদিবাসীদের ওপর হত্যা, অত্যাচার, উৎপীড়নের ঘটনার বিচার করা।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮[১০৫]

নবম জাতীয় সংসদ নিবার্চনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে ২৪ টি অনুচ্ছেদে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে তার ভেতর ‘সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও আদিবাসী সমাজ’ অন্যতম। পার্টি ঘোষণা করেছিল :

সংখ্যালঘু জাতিসত্তা ও আদিবাসী সমাজ

ক. সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর স্বকীয়তার পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান এবং সেই অনুসারে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আইন, প্রথা এবং জ্ঞান ব্যবস্থার বিষয়কে আইনের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা। সকল জাতিসত্তার শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাংলাভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষা শিক্ষা দেয়ার এবং সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ. সকল সংখ্যালঘু জাতিসত্তার স্বার্থ রক্ষা, অধিকার নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান এবং বিকাশের জন্য এ সকল জাতিসত্তার মানুষদের প্রতিনিধিত্ব সম্বলিত প্রথক প্রশাসনিক বিবাগ ও আদিবাসী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষা, চাকুরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা রাখা।

ঘ. ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ‘পার্বত্য চুক্তির’ পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠিত ভূমি কমিশন সঠিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বাস্তুভিটা ও ভূমির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া।

ঙ. জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সমাজ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে ভূমি ও প্রাণবৈচিত্র্য-জীববৈচিত্র্য বিনাশকারী সকল ধরনের তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করা। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও বনের ওপর আদিবাসীদের অধিকার ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে ভূমি কমিশন গঠন করা। ইকোপার্ক, পর্যটনকেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তোলার সময় আদিবাসীদের ওপর নিপীড়ন, আদিবাসীদের জীবন-জীবিকাকে বিপন্নকরণ, বাস্তুচ্যুতকরণ ইত্যাদি বন্ধ করা। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের অস্তিত্ব, পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবিকাকে বিপন্ন করে এমন ধরণের তথাকথিত ‘উন্নয়ন’ প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করা। যেকোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আগে স্তানীয় মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. আলফ্রেড সরেন, পীরেন স্নাল, সত্যবান হাজং, চলেশ রিছিল হথ্যাকান্ডসহ আদিবীদের ওপর হত্যা, অত্যাচার, উৎপীড়নের ঘটনার বিচার করা। সমতল ভূমির সাঁওতাল, গারো, হাজং, ওঁরাওসহ সকল সংখ্যালঘূ জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে একটি ভূমি কমিশন গঠন করা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার কাস জমি বন্টনে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া। এ বিষয়ে ১৯৫০ সালের ভূমিস্বত্ত্ব আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংখ্যালঘু জাতিস্তাসমূহের শিক্ষা, সংস্কৃতির ওপর গবেষণার জন্য পৃথক গবেষণা সেল খোলা।

---

[১০৫] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন : নির্বাচনী ইশতেহার, ২০০৮, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা, পৃ.১৮-১৯

জ. দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান সকল বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতা দূর করা। অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা। দলিত জনগোষ্ঠীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করা। নবগঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য একটা বিশেষ সেল গঠন করা।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮[১০৬]

- অনগ্রসর, পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা, চাকুরী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদাড় করা হবে।
- তফসীলি সম্প্রদায়ের জন্য প্রবর্তিত উপবৃত্তি কার্যক্রম বাড়ানো হবে।
- দেশের পার্বত্য জেলা এবং অন্যান্য স্থানে বসবাসরত উপজাতীয় ও আদিবাসীগণ যাতে তাদের নিজ মাতৃভাষা শিক্ষালাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।পাহাড়ি উপজাতীয় ও আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও একাডেমিগুলোর আরো উন্নতি করা হবে।
- মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে।
- নাগরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তজার্তিক সনদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জোরদাড় করা হবে।
- সরকারী খাসজমি বিতরণে ভূমিহীন, বিত্তহীন, বস্তিবাসী ও আশ্রয়হীনের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার সমাধানে সমন্বিত প্রস্তাব

আমরা আজকের আলাপের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এখন সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার জন্য আমাদের কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরী। ভূমি সমস্যা সমাধানে আদিবাসীরা দীর্ঘসময়ব্যাপি যেসকল দাবি-প্রস্তাব-সুপারিশ তুলেছেন এসবের বাস্তবায়ন রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করা জরুরী। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচিত সরকার আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা নিরসনে যেসকল ওয়াদা করেছিল আমরা মনে করি আজকের আলাপের মূল উদ্দেশ্য হল সরকার ও অপরাপর রাজনৈতিক দলকে বিষয়গুলো আবারো যৌক্তিকভাবে মনে করিয়ে দেয়া। যাতে আদিবাসী ভূমি সমস্যার ইতিবাচক রাজনৈতিক সুরাহার উদ্যোগ তৈরী হয়।

১. নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আদিবাসী ভূমি সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে আদিবাসীদের পূর্ণ সম্মতি ও অংশগ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আদিবাসী ভূমি সংক্রান্ত নির্বাচনী ওয়াদা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন : সমতলের সকল অঞ্চল এবং সকল জাতির আদিবাসী নারী ও পুরুষ প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ-সায়ত্ত্বশাসিত-নিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক পৃথক ‘সমতল আদিবাসীর ভূমি বিষয়ক কমিশন’ গঠন করতে হবে। ভূমি কমিশনের মাধ্যমেই স্থানীয় ভূমি বিষয়ক বিরোধ, মামলা, তথ্য নথি, দলিলপত্র সংরক্ষণ ও কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে।
৩. ভূমি জরীপ : ভূমি কমিশনের মাধ্যমে সমতলের আদিবাসী অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ভূমি জরীপ নিষ্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বনভূমির সুস্পষ্ট সীমানা এবং আদিবাসী ভূমির আইনগত সীমানা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারন করতে হবে। ভূমি অধিগ্রণ ও প্রজাস্বত্ত আইনে ১৯৫০ সমতলের সকল আদিবাসীদের নাম অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
৪. প্রথাগত ও সামাজিক অধিকার : আদিবাসীদের সংরক্ষিত পবিত্র-প্রথাগত ভূমি-বনভূমি-জলাভূমি-জলাশয়-বৃক্ষ-দেবস্থান-মন্দির-উৎসব ও মেলা এলাকা-প্রার্থনা এলাকা স্ব স্ব আদিবাসীদের সামাজিক রীতি ও আইনের মাধ্যমে পরিচালনা-রক্ষা-বিকাশের জন্য আইনগতভাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে। আদিবাসীদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহসহ আদিবাসীদের নিজস্ব সংরক্ষিত এলাকা কোনোভাবেই অধিগ্রহণ করা যাবে না।

---

[১০৬] সূত্র : **http://kanakbarman.wordpress.com/2008/12/19/manifesto-of-bnp-2008/**

৫. ভূমি ফেরত ও মিথ্যা মামলা বাতিল: আদিবাসীদের বেদখলকৃত, অর্পিত শত্রু সম্মতির নামে দখলকৃত জমি, জবরদখল হওয়া সকল জমি ও ভূমি আইনগত স্বীকৃতিসহ আদিবাসীদের মাঝে ফিরিয়ে দিতে হবে। আদিবাসীদের ভূমি সংক্রান্ত আদিবাসীদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা এবং বনবিভাগের মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাসমূহ বাতিল করতে হবে। পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমির জন্য পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ এবং অধিগ্রহণের পাওনা প্রাপ্য টাকা শোধ করতে হবে।

৬. জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক আইনের বাস্তবায়ন : আদিবাসী অঞ্চলে জাতীয় ও আন্তজার্তিক আইন ও সনদকে মান্য করে আদিবাসীদের পূর্ণ সম্মতি ছাড়া কোনো বাণিজ্যিক খনন, প্রকল্প, বিনোদনকেন্দ্র বা উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে তোলা যাবে না।

৭. নারীর ভূমি অধিকার : আদিবাসী ভূমির উপর দরিদ্র প্রান্তিক নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভূমিকেন্দ্রিক নারীর কর্মপরিসরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. স্থানীয় কাঠামো শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ভূমিআদালত ও ভূমিপরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ভূমি বিষয়ক স্থানীয় সরকার কাঠামোতে স্থানীয় স্ব স্ব আদিবাসী সমাজের নিজস্ব শাসন কাঠামোর প্রতিনিধি নেতৃত্বকে মর্যাদার সাথে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।

৯. ভূমি প্রতিবেশ ও পরিবেশ : আদিবাসী এলাকার ভূমিতে ভূমির পরিবেশ-মাটির স্বাস্থ্য-প্রতিবেশ-প্রাণবৈচিত্র্য নষ্ট হয় এমন কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেয়ার পূর্বে আদিবাসীদের পূর্ণসম্মতি থাকতে থাকতে হবে।

১০. খাস জমির অধিকার : স্থানীয় খাসজমিতে আদিবাসীদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নারীপ্রধান পরিবার, ভূমি-কৃষি-পরিবেশ-বনভূমি ও অধিকার রক্ষার আন্দোলনে শহীদ পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

আমরা আশা করি আমরা আলাপটিতে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা, সমস্যার ধরণ, কারন, ঐতিহাসিকতা, কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সমস্যা সমাধানে করণীয় কি হতে পারে এমন কিছু প্রস্তাবও হাজির করতে পেরেছি। আজকের আলাপটি সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে কিছু চিন্তা ধরিয়ে দেয়ার সূত্রধর গোছের বিবরণ। আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমসহ এক বিশাল নাগরিক সমাজও এই প্রশ্নহীন বিরাজমান সমস্যা সমাধানে আরো অধিকতর গতিশীল হয়ে উঠবে। সমতলের আদিবাসীরা নিজেদের ভূমিকেন্দ্রিক জীবন দর্শনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ...আমরা ভূমি থেকে আসি, আবার ভূমিতে ফিরে যাই। আমরা আদিবাসী জনগণের সেই অবিস্মরণীয় ভূমি স্বপ্ন ও দর্শনকে ছুঁতে চাই। আর এটি সম্ভব যদি আমরা এখন থেকেই রাজনৈতিকভাবে এর সুরাহার জন্য প্রস্তুতি নিই। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), ফরায়েজী আন্দোলন(১৮৩৮-৪৮), নীল বিদ্রোহ(১৮৫৯-৬১), সিরাজগঞ্জ কৃষকপ্রজা বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), চুয়ার বিদ্রোহ(১৭৭০-৯৯), চাকমা বিদ্রোহ(১৭৭৬-৮৭), নায়েক বিদ্রোহ(১৮০৬-১৬), হাতীখেদা আন্দোলন (১৮ শতকের শেষভাগ), পাগলপন্থী আন্দোলন(১৮২৫-২৭), কোল বিদ্রোহ(১৮২৩-১৮৮৯), ত্রিপুরার আন্দোলন (১৮৪৪-৯০), হুল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ(১৮৫৫), মোপলা বিদ্রোহ(১৮৩৬-৯৬), মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), টংক আন্দোলন, খাসিয়া বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, ভানুবিল প্রজাস্বত্ব আন্দোলন, চা বাগানে হাতবন্ধ আন্দোলন, ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলন, ফুলবাড়ি কয়লাখনি আন্দোলনসহ প্রতিদিনের যাপিত জীবনে আমরা আদিবাসীসহ দেশের মেহনতি নিম্নবর্গের লড়াকু রক্তস্রোত বহন করে চলেছি কাল থেকে কালে, ইতিহাস থেকে ইতিহাসের পানে। আমরা অবশ্যই আদিবাসীদের বঞ্চিত ভূমি অধিকারকে একদিন সফল করে তুলতে পারবোই।

বীরবান্টা আদিবাসী বয়হা-মিসেরাকো
দে বেরেৎপে দে তেংগোনপে
কোম্বড়োকো হামেট আকাৎ আবোয়া জীয়ন আইদারী আর হাসা জিরাত
লাড়হাই কাতেরেঁহবোন রুখিয়া রূয়াড় গেয়া
কুডি-টেংগন, আঃ আপাড়ি আর টাঙ্গি লাসেরমাবোন জতো জমকতে
জানাম-হাসা জিরাত রূয়াড় লাগিৎ
তিরিয়া ধামসা সাডে রূয়াড়াবোন যতো আতো জাগাওরে।
জানাম-হাসা, ররীন্দ্রনাথ সরেন

(সাঁওতালী ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ সরেনের জানাম-হাসা কবিতার বাংলা মানে দাঁড়ায় ‘জন্মভূমি’। সংগ্রামী আদিবাসী ভাই বোনেরা/ জেগে ওঠো, দাঁড়াও/ চোরেরা আমাদের অধিকার ও জমি জায়গা দখল করেছে/হারানো সম্পদ রক্ষার জন্য লড়াই করেই তা রক্ষা করবো/কোদাল-কুড়াল-তীর-

ধনুক আর টাঙ্গিতে লাগাও শান একসাথে/ফিরে পাবার জন্য আমাদের জন্মভূমি ও হারানো জমিজিরাত/বাঁশি-মাদল-নাগড়া আবার বেজে উঠুক প্রতি আদিবাসী গ্রামে গ্রামে। কবিতাটি অপ্রকাশিত)

……

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশন ও গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র আয়োজিত ‘সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি সমস্যা ও সমাধানে করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধ হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০, সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা।